মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
Human Resource Management

৯

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানব সম্পদ। সঠিকভাবে বাছাইকৃত ও নিয়োগকৃত কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য ও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারাই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ধারক হয়ে দাঁড়ায়। সব কর্মীরা সম্মিলিতভাবেই প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ হিসেবে বিরাজ করে। তাদের দক্ষতা, প্রজ্ঞা ও কর্ম-অঙ্গীকারের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সাফল্য। তাই তাদের নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া ব্যবস্থাপকদের জন্য অপরিহার্য। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠিতকরণ-কার্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদে যথাযোগ্য লোকবল নিয়োগ করে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল রাখা। সংগঠিতকরণের সাথে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কারণে কোনো কোনো ব্যবস্থাপনা বিশারদ এটিকে সংগঠিতকরণের একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন। কুঞ্জ প্রমুখের মতো গ্রন্থাকারগণ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আলাদা কার্য হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষপাতি। এ ইউনিটে আমরা ব্যবস্থাপনার আলাদা কার্য হিসেবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১: পরিচিতিমূলক আলোচনা
পাঠ - ৯.২: মানব সম্পদ পরিকল্পন
পাঠ - ৯.৩: কর্মী বাছাইকরণ ও নির্বাচন
পাঠ - ৯.৪: পদ মূল্যায়ন
পাঠ - ৯.৫: কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন
পাঠ - ৯.৬: বেতন-ভাতা নির্ধারণ
পাঠ - ৯.৭: কর্মী ওরিয়েন্টশন ও প্রশিক্ষণ

পাঠ ৯.১ পরিচিতিমূলক আলোচনা
An Introductory Discussion

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন।
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটি বলতে পারবেন।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার কার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। শুধু নব প্রতিষ্ঠিত সংগঠনেরই যে মানব সম্পদের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন এরূপ মনে করা ঠিক নয়। পুরনো, লব্ধ প্রতিষ্ঠানেও এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সারা বছর ধরেই বস্তুত পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সারা জীবনব্যাপী কর্মী বাছাইকরণ, নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, পদোন্নতি, স্থানান্তর ইত্যাদি চলতে থাকে। এ পাঠে আমরা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিচিতিমূলক একটি আলোচনা করব। পরের পাঠে আমরা মানব সম্পদ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব। মানব সম্পদ পরিকল্পনা বোঝার পর প্রতিষ্ঠান কীভাবে কর্মী বাছাই করে, নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও পদোন্নতি দিয়ে থাকে তা নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা
Human Resource Management

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার একটি কার্য। কর্মীদের বাছাইকরণ থেকে আরম্ভ করে তাদের কাজের চূড়ান্ত মূল্যায়ন (appraisal) পর্যন্ত অনেকগুলো বিষয় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যের অন্তর্ভুক্ত। বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ **হ্যারল্ড কুঞ্জ** (Harold Koontz) ও তাঁর সহযোগীরা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রযোজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনেকগুলো কার্যের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় কার্য হলো সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যকার পদগুলো পূরণ করা। এর সাথে যেসব কাজ জড়িত হয়েছে সেগুলো হলো কর্মীর প্রয়োজন নির্ধারণ, কর্মীর প্রাপ্যতা নিরূপণ, বাছাইকরণ ও নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে কর্মীর প্রশিক্ষণসহ বেতনভাতা নির্ধারণ সম্পর্কিত সব কাজ। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, যা কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন সাধন করা এবং সর্বোপরি একটি কর্মদক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদল তৈরি করার সাথে জড়িত। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্য দক্ষতার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

এ আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হলো: প্রয়োজনীয় কর্মীবাহিনীর সংখ্যা নির্ধারণ, প্রাপ্তব্য লোকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ, কর্মী বাছাইকরণ বা রিক্রুটমেন্ট (recruitment), কর্মী নির্বাচন, যথাযথ পদে তাদেরকে নিয়োগদান (placement), প্রশিক্ষণ প্রদান, বেতন বা মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ পদোন্নতি, বদলি, চাকরিচ্যুতকরণ (termination) এবং কর্মীদের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
Significance of human resource management

একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকেরা বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। তাদের কার্যাবলি পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে আরম্ভ করে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমেই ব্যবস্থাপকেরা পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং পরিকল্পনার

সাথে সংগতি রেখে সংগঠন-কার্য সম্পন্ন করেন। সংগঠন-কার্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো 'সাংগঠনিক কাঠামো' তৈরি করে বিভিন্ন 'পদ' (positions)-এর মধ্যে কর্তৃত্ব সম্পর্ক (authority relationships) নির্ধারণ করা। কিন্তু এ সম্পর্ক নির্ধারণ করার সাথে সাথে তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদেরকে এর পরেই পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়; আর তখনই শুরু হয় স্টাফিং-এর কাজ, যা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনারই অংশ। তাই দেখা যায়, স্টাফিং-এর প্রতি অবহেলা করা হলে পরিকল্পনা ও সংগঠন মূল্যহীন এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে।

প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হাসিলের জন্য সঠিক পদে সঠিক ব্যক্তিকে নিয়োগ দান অপরিহার্য। নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়াও অতীব জরুরি; নতুবা বিরাট কর্মীবাহিনী থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। তাছাড়াও, প্রয়োজনবোধে এবং সময়মত কর্মীদের পদোন্নতি দান এবং তাদের কাজের মূল্যায়ন করারও দরকার রয়েছে। এসব কার্যাবলি সঠিকভাবে পালনের ওপর একদিকে যেমন সাংগঠনিক সাবলীলতা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনও এর সাথে সম্পর্কিত।

ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং এ মানব সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আমেরিকান ব্যবস্থাপনা বিশারদ রেনসিস লিকার্ট মানব সম্পদের মূল্যের হিসাব রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, যাকে তারা 'হিউম্যান রিসোর্স একাউন্টিং' (human resource accounting) নামে অভিহিত করেছেন।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া

Process of human resource management

চিত্র ৯.১- এ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে, লক্ষ করুন। কাঠামোর বাঁ দিকে আইনগত প্রতিবন্ধকতা (legal constraints) শীর্ষক একটি কথা রয়েছে। তার মানে হলো, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া কতিপয় আইনগত প্রতিবন্ধকতার মধ্য থেকেই শুরু হয়।

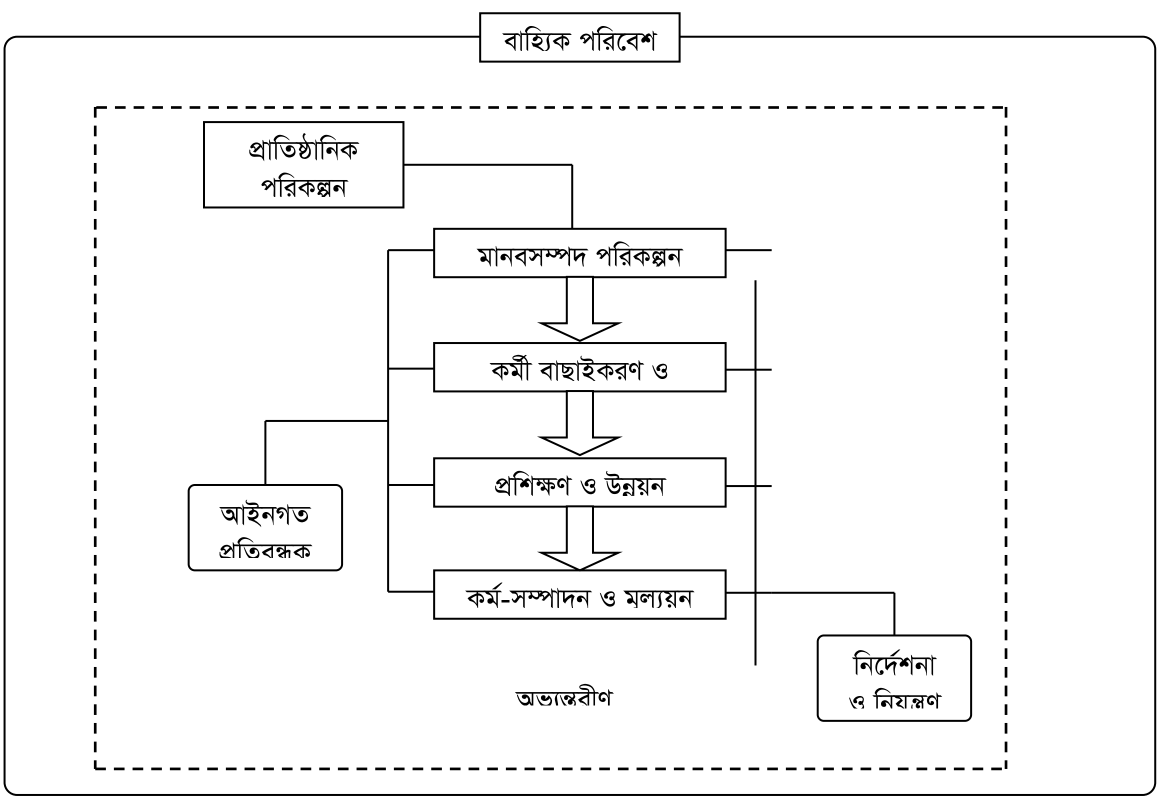

চিত্র ৯.১: মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া

এসব প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণ করে কোনো প্রতিষ্ঠান কী করতে পারবে এবং কী করতে পারবে না। চিত্রের ওপরের দিকে লক্ষ করুন, প্রক্রিয়াটির প্রথম পর্যায় হলো ‘মানব সম্পদ পরিকল্পন’। এ পর্যায়ে কতজন লোক প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার হবে এবং কতজনকে পাওয়া যাবে তার পূর্বানুমান করা এবং কর্মী সরবরাহের সাথে চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এ সম্পর্কে আমরা পরের পাঠে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যাক কর্মী বাছাই করার পর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদের নির্বাচন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক কর্মী নিজ নিজ পদে অবস্থান করে দায়িত্ব পালনকালে পদোন্নতি পেতে পারে কিংবা অন্য বিভাগে বা অন্য কোনো পদে ট্রান্সফার হতে পারে। কিংবা কর্তব্যে অবহেলা, অদক্ষতা, অশোভন আচরণ ইত্যাদি যে কোনো কারণে কোনো কর্মীর চাকরির অবসান হতে পারে। এগুলো চলমান প্রক্রিয়ার অংশ। চতুর্থ পর্যায়ে কর্মীদের কর্মসম্পাদন (performance) মূল্যায়ন করে দেখা হয়। আরও দেখা হয়, তারা অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারছেন কি না; কারো বাড়তি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি না ইত্যাদি।

চিত্রটির প্রতি ভালোভাবে লক্ষ করলে আরও দেখতে পাবেন যে, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়াটি বাহ্যিক (external) ও অভ্যন্তরীণ (internal) পরিবেশের কাঠামোর মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন উপাদানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পাঠগুলোতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার একটি কার্য। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অনেকগুলো কার্যের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় কার্য হলো সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যকার পদগুলো পূরণ করা। এর সাথে যেসব কাজ জড়িত হয়েছে সেগুলো হলো কর্মীর প্রয়োজন নির্ধারণ, কর্মীর প্রাপ্যতা নিরূপণ, বাছাইকরণ ও নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে কর্মীর প্রশিক্ষণসহ বেতনভাতা নির্ধারণ সম্পর্কিত সব কাজ। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া কতিপয় আইনগত প্রতিবন্ধকতার মধ্য থেকেই শুরু হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা নির্ধারণ করে কোনো প্রতিষ্ঠান কী করতে পারবে এবং কী করতে পারবে না। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়াটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের কাঠামোর মধ্যেই আবর্তিত হয়।

পাঠ ৯.২ মানব সম্পদ পরিকল্পন
Human Resource Planning

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানব সম্পদ পরিকল্পন কী তা বলতে পারবেন।
- মানব সম্পদ পরিকল্পনে জড়িত কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে মানব সম্পদ পরিকল্পনের খুব একটা প্রয়োজন নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো মানব সম্পদের পরিকল্পন করে না সেই প্রতিষ্ঠানগুলো একসময় বোঝতে পারে তাদের কর্মীদলের অনেকেরই নির্দিষ্ট কাজের নির্দিষ্ট যোগ্যতা নেই এবং সামগ্রিকভাবে ফলপ্রসূভাবে লক্ষ্য অর্জন হচ্ছে না। যেমন- একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চিন্তা করল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন স্বয়ংক্রিয় মেশিন স্থাপনের, কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠান উক্ত মেশিন প্রতিস্থাপনের পূর্বে মেশিনটি চালনার দক্ষতা ও জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ কিংবা বর্তমান কর্মীদের প্রশিক্ষণ না দেয় তবে হতে পারে মেশিনটি এক সপ্তাহ এমনকি এক মাস অব্যবহৃত পড়ে থাকতে পারে। পরিবর্তনশীল পরিবেশ, দক্ষ কর্মী সংকট, ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন এবং পরিবেশ রক্ষার্থে ও কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণের সরকারি চাপ- এ সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে সঠিকভাবে মানব সম্পদের পরিকল্পনা করা বর্তমান সময়ে ব্যবস্থাপকের জন্য চ্যালেঞ্জিং। এ পাঠে আমরা এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব।

মানব সম্পদ পরিকল্পন কী
What is human resource planning

মানব সম্পদ পরিকল্পন (বা জনশক্তি পরিকল্পন) সব প্রতিষ্ঠানের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানব সম্পদ পরিকল্পন বলতে বোঝায় কোনো প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (২ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর ইত্যাদি) বিভিন্ন পদে কতজন কর্মীর প্রয়োজন হবে তৎসম্পর্কিত পরিকল্পন। স্টোনার, ফ্রিম্যান এবং গিলবার্ট মানব সম্পদ পরিকল্পনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, **প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় কর্মী সম্পর্কিত পরিকল্পনকে বলা হয় মানব সম্পদ পরিকল্পন**। (Human resource planning refers to planning for the future personnel needs of an organization, taking into account both internal activities and factors in the external environment). যেসব প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে না, তারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জন করার পথে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মানব সম্পদ পরিকল্পন কীভাবে করব? একজন ব্যবস্থাপক কয়েকটি পদক্ষেপ সঠিকভাবে নিতে পারলে দক্ষতার সাথে তিনি এ পরিকল্পনা শেষ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কী কী কাজ সম্পাদন করতে হবে তা অনুধাবন করার পর ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে মানব সম্পদের প্রয়োজন বা চাহিদা সম্পর্কে পরিকল্পেনের কাজ শুরু করতে পারেন। প্রথমেই ব্যবস্থাপককে শ্রম বাজার, বর্তমান কর্মরত কর্মীবৃন্দ, সংগঠনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সাধারণ অর্থনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এরপরই তাকে এসব তথ্যের ভিত্তিতে কর্মী সম্পর্কিত চাহিদার পূর্বানুমান করতে হয় এবং এ পূর্বানুমানটি তিনি করবেন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সরবরাহ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। সরবরাহের এ বিশ্লেষণ ভবিষ্যত চাহিদা ও অভ্যন্তরীণ সরবরাহের তুলনাকরণে ব্যবস্থাপককে সাহায্য করে। তুলনাকরণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপক পূর্বানুমানকৃত ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত কর্মীদের সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন।

মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে কতিপয় কার্যাবলি জড়িত। আসুন জেনে নেই এ কার্যাবলিগুলো কী।

মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে জড়িত কার্যাবলি

Functions related to human resource planning

মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে মূলত দুটি কাজ জড়িত। এগুলো চিত্র ৯.২- এ দেখানো হয়েছে। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানব সম্পদ পরিকল্পনের সময় প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ব্যক্তিদের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে কর্ম-বিবরণী (job descriptions) ও পদ বিবরণী (job specifications) তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয়, বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন পদে কর্মরত আছে (পুরনো প্রতিষ্ঠানের বেলায়) তাদের স্থায়িত্ব, আগমন-নির্গমণের হার, শ্রম বাজারে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের প্রাপ্যতা ইত্যাদির নিরিখে প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহের পূর্বানুমান করতে হয়। এ পাঠে আমরা কার্য বিশ্লেষণ নিয়ে সার্বিক আলোচনা করব এবং পরবর্তী পাঠগুলোতে মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে জড়িত কর্মী বাছাইকরণ, নির্বাচন, কর্মী নিয়োগ-উত্তর বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব। যেহেতু কর্মী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ বড়ো ভূমিকা পালন করে সেহেতু 'প্রশিক্ষণ' নিয়ে আমরা আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কার্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

Job analysis and evaluation

যে কোনো প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে, কার্য বিশ্লেষণ ও কার্য মূল্যায়ন কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ দুটো কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ''পদ'' (পদকে এখানে আমরা ইংরেজিতে Job বলবো)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেগুলোর গুরুত্ব মূল্যায়নপূর্বক প্রত্যেক পদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কার্য-বিশ্লেষণ না করে কার্য মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে কার্য বিশ্লেষণ সমাপ্ত করা হয়, যার মাধ্যমে কর্মী বাছইকরণ, নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ পাওয়া যায়।

বস্তুত পক্ষে, কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীদের কাজকর্মের একটি তালিকা প্রস্তুত ও পদ সংক্রান্ত কর্মীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করা হয়। এক কথায় বলা যায়, কার্য বিশ্লেষণ হলো একটি সুসংবদ্ধ পন্থা যার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট পদের (job) সাথে জড়িত কার্যাবলি, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত তথ্যাবলি আহরণ ও সংগঠিত করা হয়। কোনো কোনো গ্রন্থকার কার্য বিশ্লেষণকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন, যে পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক পদ সম্পর্কিত কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং প্রত্যেক পদের জন্য কী ধরনের লোকের প্রয়োজন হবে তা স্থির করে (অর্থাৎ ব্যক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে)। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুনিপুণ কর্মসম্পাদন, কর্মী বাছাইকরণ ও কর্মীর কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্ত প্রক্রিয়ার ভিত্তি হলো কার্য বিশ্লেষণ। কার্য মূল্যায়ন (job evaluation) এবং কার্য পরিবেশে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হিসেবেও কার্য বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম । মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আলোচ্য এ বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কার্য বিশ্লেষণের গুরুত্ব ও নীতিমালা বোঝেশোনে বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতার (effectiveness) ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কর্ম বিবরণী (job descriptions) বা কর্ম তালিকা এবং পদ বিবরণী (job specifications) তৈরি করা হয়। কর্ম বিবরণী হলো কোনো একটি পদের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির তালিকা। প্রকৃত পক্ষে, কর্ম বিবরণে কর্মীকে সম্পাদন করতে হবে এমন কাজের বিবরণ ছাড়াও আরও উল্লেখ থাকে তিনি কার কাছে জবাবদিহি করবেন এবং তিনি কোন কোন পদের লোকদের কাজকর্ম তদারকি করবেন। আর, পদ বিবরণী হলো একটি পদে যিনি অধিষ্ঠিত হবেন তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি কীরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তার একটি বিবরণ। সাধারণত কর্ম বিবরণীর আলোকে পদ বিবরণী তৈরি করা হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কর্মী ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তি হিসেবে কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আহরিত তথ্য ব্যবহার করা হয়। কার্য বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপক কর্ম তালিকা ও পদ বিবরণী তৈরি করেন এবং এর ভিত্তিতে তিনি প্রার্থী বাছাইকরণ ও নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, কর্মসম্পাদন ও পদ মূল্যায়ন করেন এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। আসুন এ সকল বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত জেনে নেই।

(১) কর্ম তালিকা ও পদ বিবরণী তৈরি: কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক পদের কর্মীদের জন্য কর্ম তালিকা প্রস্তুত করা হয়। কর্ম তালিকায় কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের বিবরণ থাকে। একজন কর্মী একটি নির্দিষ্ট পদে বহাল থেকে কী কী কাজ করবে, তার তালিকাই বলা হয় কর্ম তালিকা। এ ছাড়াও, যে পদে একজন

কর্মীকে বহাল করা হবে, সে পদে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে কর্মীকে কী কী শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও গুণের অধিকারী হতে হবে, তার একটি বিবরণীও তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। এ বিবরণীর নাম হলো পদ বিবরণী যা কার্য বিশ্লেষণ তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।

(২) প্রার্থী বাছাইকরণ ও নির্বাচন: কর্ম তালিকা ও পদ বিবরণীর মধ্যে যেসব তথ্য থাকে সেগুলোর ভিত্তিতেই বিভিন্ন পদের জন্য কর্মী বাছাই ও নিয়োগ করা হয়। কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা না হলে সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা প্রায় অসম্ভব।

(৩) কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন: কর্মসম্পাদন মূল্যায়নকালে একজন কর্মীর প্রকৃত কার্যসম্পাদনের সাথে প্রত্যাশিত কার্যসম্পাদনের তুলনা করা হয়। কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতেই প্রত্যাশিত কার্য সম্পাদনের মান বা স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হয়। ফলে পরবর্তীতে তুলনামূলক মূল্যায়নও সম্ভবপর হয়।

(৪) পদ মূল্যায়ন: প্রত্যেক পদের জন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কত টাকা বেতন-ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক-অনার্থিক সুযোগসুবিধা দিতে হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য জানতে হবে প্রত্যেক পদের সাথে কী কী কাজ জড়িত রয়েছে, কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে, নিরাপত্তামূলক বিষয় আছে কিনা ইত্যাদি। এসব তথ্য কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পদের আপেক্ষিক মূল্য (relative worth) কার্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই নিরূপণ করা হয়।

(৫) প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ: কার্য বিশ্লেষণের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত কর্ম তালিকা দেখেই বোঝা যায়, একজন কর্মীকে কী কী ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে এবং সেজন্য তাকে কীরূপ প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

সমগ্র এ আলোচনা থেকে আমরা বোঝলাম কর্ম তালিকা ও পদ বিবরণীর মধ্যে যেসব তথ্য থাকে সেগুলোর ভিত্তিতেই বিভিন্ন পদের জন্য কর্মী বাছাই ও নিয়োগ করা হয়। একজন ব্যবস্থাপকের জন্য কর্মী বাছাই ও নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরের পাঠে আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

মানব সম্পদ পরিকল্পন বলতে বোঝায় কোনো প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিভিন্ন পদে কতজন কর্মীর প্রয়োজন হবে তৎসম্পর্কিত পরিকল্পন। মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে কতিপয় কার্যাবলি জড়িত। মানব সম্পদ পরিকল্পনের সময় প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ব্যক্তিদের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে কর্ম-বিবরণী ও পদ বিবরণী তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয়, বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন পদে কর্মরত আছে তাদের স্থায়িত্ব, আগমন-নির্গমণের হার, শ্রম বাজারে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের প্রাপ্যতা ইত্যাদির নিরিখে প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহের পূর্বানুমান করতে হয়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে, কার্য বিশ্লেষণ ও কার্য মূল্যায়ন কর্মী ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কার্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীদের কাজকর্মের একটি তালিকা প্রস্তুত ও পদ সংক্রান্ত কর্মীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য আহরণ করা হয়।

পাঠ ৯.৩ কর্মী বাছাইকরণ ও নির্বাচন
Employee Recruitment and Selection

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কর্মী বাছাইকরণের অর্থ ও প্রকৃতি বলতে পারবেন।
- কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ-উত্তর বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলে প্রথমেই কর্মী বাছাইকরণের প্রশ্ন এসে যায়। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ করার পর কর্মী বাছাই করা হয়। এ বাছাই প্রক্রিয়ার সময় ব্যবস্থাপককে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভুল হলে এর খেসারত পুরো প্রতিষ্ঠানকে দিতে হয়। এ পাঠে আমরা কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বাছাইকরণ ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

কর্মী বাছাইকরণ: অর্থ ও প্রকৃতি
Employee recruitment: Meaning and nature

কর্মী বাছাইকরণ বলতে সোজা কথায় কর্মী সংগ্রহকরণকে বোঝায়। বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীর চাহিদা মেটানোর জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটা 'পুল' (pool) তৈরি করে। পুল তৈরি করার জন্য তারা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়; যেমন- গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন প্রচার, এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির সাহায্য গ্রহণ, কনসাল্টিং ফার্মের সহায়তা গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সাথে যোগাযোগ করা ইত্যাদি।

প্রার্থী নির্বাচনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রার্থী বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়ে একটি 'সংক্ষিপ্ত তালিকা' (shortlist) তৈরি করে সেখান থেকে চূড়ান্তভাবে যোগ্যতর প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়।

অনেকে রিক্রুটমেন্ট (বাংলায় যাকে 'কর্মী সংগ্রহ' বলা যায়) এবং সিলেকশন (নির্বাচন)- এ দুটো পদবাচ্যকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকে। এ দুটো বিষয় অবশ্যই এক নয়, তবে পরস্পর সম্পর্কিত। রিক্রুটমেন্টের উদ্দেশ্য হলো, সম্ভাব্য কর্মী (recruits) আকৃষ্ট করে প্রতিষ্ঠানের কর্মীর চাহিদা পূরণ করা। পক্ষান্তরে, নির্বাচনের উদ্দেশ্য হলো, সম্ভাব্য কর্মীদের মধ্য থেকে যোগ্য কর্মী খুঁজে বের করে তাদেরকে যথাযথ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

কর্মী বাছাইকরণের বিভিন্ন উৎস: বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাই করা যায়। প্রধান উৎসগুলো হলো:

১. বিজ্ঞাপন (Advertising)
   - দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন
   - ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন
   - রেডিও-টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন
   - কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারনেট বিজ্ঞাপন

২. কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান (Employment Agencies)
   - সরকার কর্তৃক পরিচালিত (যেমন—ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং, ঢাকা)
   - অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত
   - বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত (বিশেষ করে কনসাল্টিং ফার্মগুলো এ ব্যাপারে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করে)

৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (Universities and Colleges)

৪. কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্যভান্ডার (Employment Data Bases)

বাংলাদেশে এরূপ ডাটাবেজ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় Career Placement Registry, Inc. নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন চাকরি প্রার্থীর বায়োডাটা সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করে এবং কম্পিউটারে অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট তথ্য সরবরাহ করে। অন্যরা ৫০ ডলারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৫. রেফারেল (Referral) ও ওয়াক-ইন (Walk-in)। বর্তমান কর্মী ও বন্ধুবান্ধব কর্তৃক রেফার করা ব্যক্তিরাও সম্ভাব্য প্রার্থীগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যারা কোম্পানি অফিসে গিয়ে সরাসরি আবেদনপত্র জমা দেয় তাদেরকে Walk-in প্রার্থী বলা হয়।

বিভিন্ন উৎসকে কাজে লাগিয়ে কর্মী বাছাইকরণের পরই কর্মী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আসুন এ সম্পর্কে জেনে নেই।

কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ-উত্তর বিভিন্ন বিষয়াদি

Selection of employees and different issues related to post-placement

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাছাইকৃত দরখাস্ত থেকে নির্দিষ্ট পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যবস্থাপককে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখতে হয়, কারণ নিয়োগ-ভ্রম (hiring errors)- এর কারণে প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাহলে, কর্মী নির্বাচন কী? কর্মী নির্বাচন হচ্ছে, যে কাজের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে সে কাজে কোন কর্মী সফল হবে তার পূর্বানুমান করা। ধরুন, বিক্রয় কর্মী হিসেবে কাউকে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পূর্বানুমান করতে হবে কোন প্রার্থী বেশি পরিমাণ পণ্য বা সেবা বিক্রয় করতে সক্ষম।

কর্মী নিয়োগের পর কতিপয় বিষয়াদি রয়েছে যা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। আসুন বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই।

⊙ **পদোন্নতি (Promotion):** পদোন্নতিও এক ধরনের কর্মী নির্বাচন। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যেসব কর্মী নিয়োজিত থাকে, তাদের মধ্য থেকে কোনো পদে একজন কর্মীকে বর্তমানের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদাসহ নিয়োগ দেওয়া হলে তা পদোন্নতি নামে অভিহিত হয়। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তর থেকে কর্মী নির্বাচিত করা হয় বলে পদোন্নতি অভ্যন্তরীণ কর্মীদের মধ্যেই সর্বদা সীমিত থাকে। পদোন্নতি এক প্রকারের বদলিও (transfer) বটে। এরূপ বদলির ক্ষেত্রে পূর্বের পদের চেয়ে নতুন পদের বেতন, মর্যাদা ও সুযোগসুবিধা অধিকতর হয়। কর্মীদের কর্ম আনুগত্য এবং প্রেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখা হয়। বর্তমান পদ থেকে ওপরে ওঠার সুযোগ রাখা না হলে কর্মীরা কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; কর্মস্পৃহাও কমে যায় এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। তাই পদোন্নতিকে উন্নতমানের কর্মসম্পাদনের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের একটি পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদেরকে দুভাবে পদোন্নতি দেওয়া যায়। একটিকে বলা হয় উল্লম্ব পদোন্নতি এবং আরেকটিকে বলা হয় সমান্তরাল পদোন্নতি। উল্লম্ব পদোন্নতির ক্ষেত্রে একজন কর্মীকে তার নিজের বিভাগের ভেতরেই একধাপ উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার বর্তমান পদ থেকে অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চতর পদে তাকে আসীন করা হয়। অন্যদিকে, সমান্তরাল পদোন্নতির ক্ষেত্রে একজন কর্মীকে তার নিজ বিভাগ থেকে অন্য একটি বিভাগে বর্তমান পদ থেকে উচ্চতর বদলি করা হয়। এখানেও উন্নীত পদের মর্যাদা অধিকতর হয়।

⊙ **পদাবনতি (Demotion):** পদাবনতি হলো পদোন্নতির বিপরীত অবস্থা। যখন একজন কর্মীকে তার বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে এক ধাপ নিম্নস্তরের পদে আসীন করা হয়, তা পদাবনতি নামে পরিচিত। একজন 'বিভাগীয় ব্যবস্থাপক'-কে ব্যবস্থাপকের পদ থেকে সহকারী ব্যবস্থাপকের পদে বহাল করা হলে বলা যায় যে, তার পদাবনতি হয়েছে। পদাবনতির ফলে কর্মীর পদমর্যাদা হ্রাস পায়, বেতন কমে যায় এবং অফিসিয়াল ক্ষমতা খর্ব হয়। কোনো কর্মীকে তার অযোগ্যতার জন্য শাস্তিস্বরূপ পদাবনতি করা যায়। পদাবনতি খুবই সাবধানতার সাথে করা বাঞ্ছনীয়। পরিহার করাই বরং শ্রেয়। কারণ পদাবনতি কর্মীর জন্য অপমানজনক। তাই পদাবনতির শিকার কর্মীরা অসন্তুষ্ট কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠানে ভালো কাজ করার আগ্রহ পাবে না। তাছাড়া, অন্যান্য কর্মীরাও এতে প্রভাবিত হতে পারে। সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণে পদাবনতি কার্যকর না হলে অসন্তোষ দেখা দিবে; শ্রমিক সংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং পরিণামে পরিবেশের অবনতি ঘটতে পারে।

⊙ **পদচ্যুতি বা বরখাস্ত (Termination or Dismissal):** একজন কর্মীকে তার চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হলে তা বরখাস্ত বা পদচ্যুতি নামে পরিচিত। একজন নিয়োগকর্তা তখনই একজন কর্মীকে বরখাস্ত করে যখন- কর্মী তার দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়; কর্মী শারীরিক বা মানসিক কারণে কাজ করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়; প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করে কিংবা সতর্কবাণী সত্ত্বেও বারবার একই প্রকার ভুল করে; কর্মী 'অঘটনের নায়ক' বা trouble-maker হিসেবে অভিযুক্ত হয়।

⊙ **পদত্যাগ (Resignation):** কোনো কর্মী চাকরি ছেড়ে দিলে তা পদত্যাগ বা ইস্তফা নামে পরিচিত। পদত্যাগও এক প্রকারের পদচ্যুতি যা কর্মীর নিজের উদ্যোগেই সংঘটিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন কারণে একজন কর্মী পদত্যাগ করতে পারে: প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে পদোন্নতি না পাওয়ার আশংকা, আত্মমর্যাদা নিয়ে কাজ করার মতো পরিবেশের অভাব, ঊর্ধ্বতন কর্তৃক অমর্যাদাকর আচরণ, ভালো কাজের স্বীকৃতি না পাওয়া, সামান্য ভুলের জন্য জনসমক্ষে তিরস্কৃত হওয়া, কম বেতন-ভাতা, কর্মঅসন্তুষ্টি, শারীরিকভাবে ক্ষতিকর কর্ম পরিবেশ, নির্ধারিত অফিস সময়ের পরেও বিনা ওভারটাইম-ভাতায় কাজ করার চাপ, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি।

⊙ **কর্মী ছাঁটাই (Redundancy or Lay-off):** সাধারণত অর্থনৈতিক মন্দা (depression/recession) বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পরিবর্তনের কারণে প্রতিষ্ঠানের ওপর আর্থিক চাপ হ্রাস করার লক্ষ্যে কর্মী ছাঁটাই করা হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে: অনিবার্য কারণবশত (যথা কাঁচামালে দুস্প্রাপ্যতা, অব্যাহত চাঁদাবাজি/সন্ত্রাস) ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হলে; বাজারে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত বা বিক্রিতব্য পণ্যের চাহিদা বিপুলভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোটো করার প্রয়োজন দেখা দিলে; শ্রমিক অসন্তোষ বা রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণে প্রতিষ্ঠান চালু রাখা কঠিন প্রতিয়মান হলে; বিভিন্ন কারণে অব্যাহতভাবে লোকসান চলতে থাকলে; দীর্ঘস্থায়ী বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন হলে, ইত্যাদি।

সাময়িক কর্মী ছাঁটাই লে-অফ (Lay-off) নামে সুপরিচিত। বস্তুত পক্ষে, লে-অফ এমন একটি পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয় যখন তিনটি অবস্থা বিরাজমান থাকে: (১) ছাঁটাইযোগ্য কর্মীর জন্য কোনো কাজ থাকে না; (২) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আশা করে যে, 'কাজ-নাই' (no-work) পরিস্থিতি দীর্ঘকাল বিরাজ করবে না এবং (৩) কিছুকাল পরেই ছাঁটাইকৃত কর্মীদের পুনর্বহাল করা সম্ভব হবে।

সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে, লে-অফ, পদচ্যুতির মতো নয়। পদচ্যুতি হলো স্থায়ী চাকুরিচ্যুতি আর লে-অফ হলো ক্ষণস্থায়ী চাকরিচ্যুতি। অবশ্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান লে-অফ-কে স্থায়ী চাকরিচ্যুতির বাহানা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

অবসর (Retirement): একজন কর্মী নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সের পর অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের চাকরির সমাপ্তির পর চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এ প্রক্রিয়া অবসর গ্রহণ নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারীরা ৬০ বছর বয়সে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ৬৫ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ করে। কোনো কর্মী ইচ্ছা করলে মেয়াদ পূর্তির আগেও অবসর গ্রহণ করতে পারে যা early retirement নামে অভিহিত হয়। অবসর গ্রহণের কারণে কর্মীরা কতিপয় বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করে।

আমরা কর্মী বাছাইকরণ, নির্বাচন এবং নিয়োগ-উত্তর বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে জানলাম। এগুলো ছড়াও আমাদের জানা দরকার পদ মূল্যায়ন কী এবং কীভাবে তা করা হয়ে থাকে। একই সাথে জানা প্রয়োজন, একজন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পর তার সম্পাদিত কর্ম কীভাবে মূল্যায়িত হতে পারে। আসুন পর্যায়ক্রমে পরের পাঠগুলো অধ্যয়ন করে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

সারসংক্ষেপ

বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীর চাহিদা মেটানোর জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটা 'পুল' তৈরি করে। পুল তৈরি করার জন্য তারা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়; যেমন- গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন প্রচার, এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির সাহায্য গ্রহণ, কনসাল্টিং ফার্মের সহায়তা গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সাথে যোগাযোগ করা ইত্যাদি। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর সঠিক ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাছাইকৃত দরখাস্ত থেকে নির্দিষ্ট পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কর্মী নির্বাচন হচ্ছে, যে কাজের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে সে কাজে কোন কর্মী সফল হবে তার পূর্বানুমান করা। পদোন্নতিও এক ধরনের কর্মী নির্বাচন। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যেসব কর্মী নিয়োজিত থাকে, তাদের মধ্য থেকে কোনো পদে একজন কর্মীকে বর্তমানের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদাসহ নিয়োগ দেওয়া হলে তা পদোন্নতি নামে অভিহিত হয়। পদাবনতি হলো পদোন্নতির বিপরীত অবস্থা। যখন একজন কর্মীকে তার বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে এক ধাপ নিম্নস্তরের পদে আসীন করা হয়, তা পদাবনতি নামে পরিচিত। কিন্তু যদি একজন কর্মীকে তার চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হলে তা বরখাস্ত বা পদচ্যুতি নামে পরিচিত। কোনো কর্মী চাকরি ছেড়ে দিলে তা পদত্যাগ বা ইস্তফা নামে পরিচিত। পদত্যাগও এক প্রকারের পদচ্যুতি যা কর্মীর নিজের উদ্যোগেই সংঘটিত হয়ে থাকে। একজন কর্মী নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সের পর অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের চাকরির সমাপ্তির পর চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এ প্রক্রিয়া অবসর গ্রহণ নামে পরিচিত। কোনো কর্মী ইচ্ছা করলে মেয়াদ পূর্তির আগেও অবসর গ্রহণ করতে পারে যা early retirement নামে অভিহিত হয়।

পাঠ ৯.৪ পদ মূল্যায়ন
Job Evaluation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পদ মূল্যায়ন কী তা বলতে পারবেন।
- পদ মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পদ মূল্যায়ন বলতে বিভিন্ন পদ (jobs)-এর আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে একটি পদের তুলনায় আরেকটি পদ কতটুকু বেশি বা কম বা সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা নিরূপণ করার লক্ষ্যে যে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তারই নাম পদ মূল্যায়ন। **গোমেজ-মেজিয়া, বাল্কিণ ও কার্ডি**-এর ভাষায়: Job evaluation is the process of evaluating the relative value or cortribution of different jobs to an organization. পদ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পদ- এর আপেক্ষিক (relative) মূল্য বা অবদান মূল্যায়ন করা হয়, কোনো কর্মীর অবদান বা মূল্যায়ন নয়। বিভিন্ন পদ- এর মধ্যকার আপেক্ষিক মূল্য বেতন-স্কেলের মাধ্যমে যাতে প্রকাশ করা যায়, সেজন্য পদ মূল্যায়ন করা হয়। পদ মূল্যায়নে বিভিন্ন পদের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়। পদ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখা হয়: কী কী কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে এবং কোন কোন কাজের কারণে এক পদ থেকে আরেক পদ ভিন্ন হয়ে থাকে। কতিপয় পূর্ব-নির্ধারিত মানদণ্ড বা উপাদানের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক পদের মূল্যায়ন করা হয়। মূলত বেতন বা মজুরি স্কেল নির্ধারণের জন্যই পদ মূল্যায়ন করা হয়।

পদ মূল্যায়নের পদ্ধতি
Methods of job evaluation

পদ-মূল্যায়নের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তবে চারটি পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. র‌্যাংকিং পদ্ধতি
২. গ্রেডিং পদ্ধতি
৩. পয়েন্ট পদ্ধতি
৪. উপাদান তুলনাকরণ পদ্ধতি

(১) র‌্যাংকিং পদ্ধতি (Ranking method): র‌্যাংকিং পদ্ধতি অনুসারে একটি পদকে অন্যান্য সকল পদের আঙ্গিকে র‌্যাংকিং করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক পদকে গুরুত্ব অনুসারে ১ম, ২য়, ৩য় এভাবে পরপর সাজানো হয়। পদ র‌্যাংকিং করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়:

- পদ সম্পর্কিত তথ্য আহরণ
- যেসব পদের র‌্যাংকিং করা হবে সেগুলো নির্বাচন করা
- যে উপাদানের ভিত্তিতে পদগুলোকে র‌্যাংক অনুসারে সাজানো হবে সেগুলো নির্ধারণকরণ
- পদগুলোকে র‌্যাংক অনুযায়ী সাজানো
- একাধিক কমিটি কর্তৃক র‌্যাংকিং করা হলে সবার র‌্যাংক-এর গড়করণ।

(২) গ্রেডিং পদ্ধতি (Grading method): এ পদ্ধতি অনুসারে পদগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। এ কারণে গ্রেডিং পদ্ধতি 'পদ শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি' (job classification method) নামেও পরিচিত। পদের শ্রেণিবিন্যাস করার কয়েকটি পন্থা আছে। একটি পন্থা হলো শ্রেণি বিবরণী (class descriptions) তৈরি করা এবং এ

বিবরণের সাথে সংগতি রেখে পদগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা। [এখানে শ্রেণি বিবরণী বলতে কর্ম তালিকাকে (job descriptions) বোঝানো হচ্ছে।] আরেকটি পন্থা হলো, প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কতিপয় শ্রেণি-বিন্যাসকরণ নিয়মাবলি (classifying rules) তৈরি করে তদনুযায়ী পদগুলোকে আলাদাভাবে বিভক্ত করা।

(৩) পয়েন্ট পদ্ধতি (Point method): এটি একটি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ব্যবহৃত করতে হলে দুটি বিষয়ের প্রতি প্রথমেই নজর দিতে হবে:

(ক) অনেকগুলো 'পারিতোষিকযোগ্য উপাদান' (compensable factors) চিহ্নিত করতে হবে- প্রত্যেক উপাদানের কয়েকটা মাত্রা (degree) থাকবে এবং

(খ) এ উপাদানগুলো প্রত্যেক পদে কী মাত্রায় বিদ্যমান আছে তা নির্ধারণ করতে হবে।

দক্ষতা ও দায়িত্ব পারিতোষিকযোগ্য উপাদানের উদাহরণ। প্রত্যেক উপাদানের প্রত্যেক মাত্রার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দেওয়া হয়। একটি পদে প্রত্যেক উপাদানের মাত্রা নির্ধারণ করার পর প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ঐ পদের জন্য সার্বিক পয়েন্ট পাওয়া যাবে।

পয়েন্ট-প্ল্যান তৈরি করা সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই অনেক প্রতিষ্ঠান যারা পয়েন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে আগ্রহী তারা 'প্যাকেজ পয়েন্ট-প্ল্যান' সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এবং ন্যাশনাল ট্রেড এসোসিয়শেন স্ট্যান্ডার্ডাইজড পয়েন্ট-প্ল্যান তৈরি করেছে। অজস্র প্রতিষ্ঠান এগুলো হুবহু অথবা সামান্য পরিমার্জনের পর ব্যবহার করছে।

(৪) উপাদান তুলনাকরণ পদ্ধতি (Factor comparison method): এটিও একটি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি। বহুল ব্যবহৃত এ পদ্ধতি অনুসারে পদগুলোকে বিভিন্ন প্রকারের দক্ষতা ও কঠিনতা উপাদান অনুযায়ী (Skill and difficulty factors) র‌্যাংকিং করা হয়। এরপর র‌্যাংকিংগুলোকে যোগ করে প্রত্যেক পদের সার্বিক সংখ্যাত্মক র‌্যাংকিং নির্ণয় করা হয়। এটি র‌্যাংকিং পদ্ধতিরই একটি পরিমার্জিত রূপ। র‌্যাংকিং পদ্ধতিতে একটিমাত্র সার্বিক উপাদানের ভিত্তিতে প্রত্যেক পদকে একটি সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে র‌্যাংকিং করা হয়। অন্যদিকে, উপাদান-তুলনাকরণ পদ্ধতিতে প্রত্যেক পদকে কয়েক বার র‌্যাংকিং করা হয়- নির্ধারিত প্রত্যেক পারিতোষিকযোগ্য উপাদানের জন্য মাত্র একবার র‌্যাংকিং করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমে একটি পদকে দক্ষতা (skill) উপাদানের জন্য র‌্যাংকিং করা হলো; এরপর দায়িত্ব (responsibility) উপাদানের জন্য এবং শেষে কঠিনতা (Difficulty) উপাদানের জন্য র‌্যাকিং করা হলো। এভাবে তিনবার তিনটি উপাদানের জন্য র‌্যাংকিং করার পর তিনটি র‌্যাকিং যোগ করার পর ঐ পদের সার্বিক র‌্যাকিং পাওয়া যাবে।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের ভেতরে একটি পদের তুলনায় আরেকটি পদ কতটুকু বেশি বা কম বা সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা নিরূপণ করার লক্ষ্যে যে তুলনামূলক বিচারবিশ্লেষণ করা হয় তারই নাম পদ মূল্যায়ন। পদ মূল্যায়নে বিভিন্ন পদের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়। পদ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখা হয়: কী কী কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে এবং কোন কোন কাজের কারণে এক পদ থেকে আরেক পদ ভিন্ন হয়ে থাকে। পদ-মূল্যায়নের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তবে চারটি পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: র‌্যাংকিং পদ্ধতি, গ্রেডিং পদ্ধতি, পয়েন্ট পদ্ধতি এবং উপাদান তুলনাকরণ পদ্ধতি। র‌্যাংকিং পদ্ধতি অনুসারে একটি পদকে অন্যান্য সকল পদের আঙ্গিকে র‌্যাংকিং করা হয়। গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসারে পদগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। পয়েন্ট এবং উপাদান তুলনাকরণ পদ্ধতি একটি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি।

পাঠ ৯.৫ কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন
Performance Appraisal

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পদ মূল্যায়ন কী তা বলতে পারবেন।
- পদ মূল্যায়নের পদক্ষেপ ও পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন কীভাবে করা হয় তা বলতে পারবেন।

একজন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তন্মধ্যে কর্মীদের কর্মসম্পাদন (বা পারফরমেন্স) পরিমাপকরণ অন্যতম। মনে করা হয় যে, কর্মীদের কর্মসম্পাদনের সঠিক পরিমাপ ফলপ্রসু ব্যবস্থাপনার একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এ পাঠে আমরা প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরব। এ পাঠের প্রথম লক্ষ্য হলো, কর্মসম্পাদন পরিমাপ ব্যবস্থার (performance measurement systems) ভিত্তি, ডিজাইন ও বাস্তবায়নের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, ফলপ্রসূ কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের নীতিমালা বর্ণনা করা যাতে এ পাঠটি অধ্যয়ন করার পর কীভাবে ইতিবাচক মূল্যায়ন পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তৎসম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা জন্মে।

কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন কী
What is performance appraisal

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের কর্মসম্পাদন (প্রত্যেক দিন স্ব স্ব পদে থেকে তারা যেসব কাজ করে) পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা করার প্রক্রিয়া কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন (performance appraisal) নামে পরিচিতি। গ্রোতের (Grote) মতে, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন হলো, Identification measurement and management of human performance in organization.[১] এ সংজ্ঞায় তিনটি বিশেষ পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১. **সনাক্তকরণ (Identification):** এখানে সনাক্তকরণ মানে হলো কর্মসম্পাদন পরিমাপের সময় ব্যবস্থাপক যেসব কার্যক্ষেত্র পরিমাপ করবে সেগুলো চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করা। কর্মীদের কাজের সাথে সম্পর্কহীন কোনো বিষয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না; যেমন- বয়স, জাতীয়তা, পুরুষ বা মহিলা ইত্যাদি।
২. **পরিমাপ (Measurement):** পরিমাপ বলতে বোঝায় কর্মীদের কর্মসম্পাদন কতটুকু 'ভালো' বা 'মন্দ' তৎসম্পর্কে ব্যবস্থাপকের অভিমত (judgment) মূল্যায়ন ব্যবস্থার মূল উপাদান হলো পরিমাপ। প্রতিষ্ঠানের সব বিভাগে পরিমাপ ব্যবস্থা এক রকম হওয়া অপরিহার্য।
৩. **ব্যবস্থাপনা (Management):** এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কর্মসম্পাদান মূল্যায়নের সময় কর্মীদের কর্মসম্পাদন সম্পর্কে যেসব ত্রুটি বা অপর্যাপ্ততা খোঁজে পাওয়া যাবে, সেগুলো যাতে তারা ভবিষ্যতে পরিহার করে নিজের প্রচ্ছন্ন প্রতিভার বা ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে সেজন্য ব্যবস্থাপক কর্মীদেরকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিবে। এখানে ব্যবস্থাপক অতীতমুখী না হয়ে ভবিষ্যৎমুখী হবে।

[১] Grote, R.C. (2010). *The performance appraisal question and answer book: A survival quide for managers*. New York: American management Association.

কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সাধারণত বছরে একবার করা হয়। কর্মীদের উর্ধ্বতন বা সুপারভাইজার মূলত কতিপয় নির্দেশকের প্রেক্ষিতে কর্মীদেরকে মূল্যায়ন করে।

কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের পদক্ষেপসমূহ
Steps in performance appraisal

কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের সাথে তিনটি পদক্ষেপ জড়িত। আসুন পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

(১) পদ সংজ্ঞায়িতকরণ (Defining the job): প্রথমেই যে পদের ব্যক্তির কার্যাবলি মূল্যায়ন করা হবে, সে পদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তব্য-কর্ম ও কাজের মান (duties and job standards) সুনির্দিষ্ট করতে হবে। অনেক সময় শুধুমাত্র কর্ম-তালিকা দেখে বোঝা মুশকিল, কর্মীর সুপারভাইজার তার কাছ থেকে কী কী কাজ প্রত্যাশা করে। এরূপ ঘটে এজন্য যে, কর্ম-তালিকার বাহিরেও অনেক কাজ করার জন্য মুখে মুখে নির্দেশ দেওয়া হয়। একারণে প্রত্যেক কাজের জন্য পরিমাপযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড বা মান নির্ধারণ করা আবশ্যক, যাতে পরবর্তীতে কর্মসম্পাদন সে মানের প্রেক্ষিতে পরিমাপ করা যায়।

(২) কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন (Appraising performance): প্রথম ধাপে কর্মীর কাজের যে মান নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর আলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্মীর কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নির্ধারিত মানের সাথে কর্মীর বাস্তব কাজ তুলনা করে দেখা হয়। সাধারণত রেটিং ফরমের (Rating form) সাহায্যে তুলনাকরণের কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

(৩) ফলাবর্তনের ব্যবস্থাকরণ (Providing feedback): কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করার পর যে ফলাফল পাওয়া যায় তা সংশ্লিষ্ট কর্মীকে অবহিত করার ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। সরকারি প্রতিষ্ঠানে এরূপ ফলাবর্তনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কিন্তু অধিকাংশ সফল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ফলাবর্তনের ব্যবস্থা থাকে। নাম করা কোম্পানিগুলোতে সুপাভাইজর ও কর্মী এক টেবিলে বসে মূল্যায়নের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে এবং কর্মীর কাজের মান আরও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে।

কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের পদ্ধতিসমূহ
Methods of performance appraisal

কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠান তার কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারণ করে কোন ধরনের পদ্ধতি কর্মীদের মূল্যায়নের জন্য সঠিক। সর্বাধিক জনপ্রিয় কিছু পদ্ধতি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

(১) গ্রাফিক রেটিং স্কেল পদ্ধতি (Graphic rating scale method): কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো গ্রাফিক রেটিং স্কেল। এ পদ্ধতি অনুসারে কতিপয় গুণাবলি বা লক্ষণীয় নির্দেশক (traits)- এর তালিকা প্রস্তুত করে প্রত্যেকটি নির্দেশকের জন্য কর্মসম্পাদনের রেঞ্জ (অসন্তোষজনক - খুবই সন্তোষজনক) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নির্দেশকের বিপরীতে কর্মীর জন্য রেটিং দেওয়া হয় (গোলাকার বৃত্ত বা টিক চিহ্ন দিয়ে)। এরপর নির্দেশকগুলোর জন্য প্রদত্ত সংখ্যা (মূল্যায়ন) যোগ করা হয়। ডেসলার-এর বর্ণনা মতেঃ ''Graphic rating scale is a scale that lists a number of traits and a range of performance for each. The employee is then rated by identifying the score that best describes his or her level of performance for each trait.''[২]

(২) অলটারনেশন র‍্যাংকিং পদ্ধতি (Alternation ranking method): কতিপয় নির্দেশক (trait) অনুযায়ী একজন কর্মীকে ''শ্রেষ্ঠ'' (best) থেকে ''নিকৃষ্ট'' (worst) এভাবে র‍্যাংকিং করা হয়। প্রথমে কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের জন্য কর্মীদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। দ্বিতীয়ত, একটি ফরমের মধ্যে নির্দেশক/বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোন কর্মী সবচেয়ে বেশি এবং কোন কর্মী সবচেয়ে কম নম্বর পাবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর 'পরবর্তী সর্বোচ্চ' (next highest) নম্বর

[২] Gary Dessler (2020). *Human Resource Management*. 16th Edition. Pearson Education.

এবং 'পরবর্তী সর্বনিম্ন' (next lowest) নম্বর কারা পাবে তা রেকর্ড করা হয়। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সব কর্মীর র‍্যাংকিং শেষ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

(৩) যুগল তুলনাকরণ পদ্ধতি (Paired comparison method): এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক কর্মীকে অন্যান্য সব কর্মীর সাথে জোড়ায় জোড়ায় তুলনা করা হয়। এ তুলনা প্রত্যেকটি নির্ধারিত নির্দেশকের (যথা- কাজের পরিমাণ, কাজের গুণাগুণ ইত্যাদি) জন্যই করা হয়ে থাকে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করি, একটি প্রতিষ্ঠানে ৫ জন কর্মীর কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করতে হবে। যুগল তুলনাকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে আমরা ৫ জন কর্মীর জন্য প্রত্যেকটি নির্দেশকের ভিত্তিতে যতগুলো যুগল (জোড়া) হওয়া সম্ভব তার একটি চার্ট তৈরি করি। এরপর প্রত্যেক নির্দেশকের ক্ষেত্রে এক জোড়ার মধ্যে কে অধিকতর উত্তম বা শ্রেয়তর কর্মী তা নির্দেশ করি। পরবর্তীতে, একজন কর্মী যতবার শ্রেয়তর নির্দেশিত হয়েছে তা যোগ করি। যোগফল দেখে আমরা বোঝতে পারব, সব কর্মীর মধ্যে কে সর্বোচ্চ র‍্যাংকিং অর্জন করেছে।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পদ্ধতি (Critical incident method): এ পদ্ধতিতে সুপাভাইজর বা ঊর্ধ্বর্তন প্রত্যেক অধীনস্থ কর্মীর স্বাভাবিক ভালো বা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের রেকর্ড সংরক্ষণ করেন। প্রতি ছয় মাস বা নির্ধারিত সময় পরপর সুপারভাইজর কর্মীর সাথে বসে কর্মীর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং রেকর্ডকৃত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলোকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। এ পদ্ধতি অন্যান্য যে কোনো মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু আলাদাভাবে ব্যবহার করে কর্মীদের তুলনা করা যাবে না।

(৫) আচরণিকভাবে সংগ্রথিত রেটিং স্কেল (Behaviorally anchored rating scale): এ পদ্ধতিতে বর্ণনামূলক 'গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' পদ্ধতির সাথে সংখ্যাত্মক পদ্ধতি গ্রথিত করে দিয়ে উভয় পদ্ধতির উপকারিতা লাভের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ পদ্ধতির জন্য সঠিক ফরম তৈরি করা যথেষ্ট কঠিন।

(৬) এমবিও পদ্ধতি (MBO method): একে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Management by Objectives) বলা হয়। এ পদ্ধতি অনুসারে কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ছয়টি ধাপ অনুসরণ করা হয়:

(ক) প্রতিষ্ঠানের জন্য সামগ্রিক লক্ষ্য স্থির করে (পরবর্তী বছরের জন্য)।

(খ) বিভাগীয় প্রধানগণ তাদের ঊর্ধ্বতনদের সাথে যৌথভাবে বিভাগের জন্য 'বিভাগীয় লক্ষ্য' নির্ধারণ করে।

(গ) বিভাগীয় প্রধান বিভাগের কর্মীদের সাথে বসে বিভাগের লক্ষ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রত্যেক কর্মীকে নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করার জন্য অনুরোধ জানায়।

(ঘ) বিভাগীয় প্রধান ও কর্মীরা মিলে স্বল্পমেয়াদি কর্মসম্পাদন-টার্গেট নির্ধারণ করে।

(ঙ) বিভাগীয় প্রধান টার্গেটের সাথে কর্মীদের বাস্তব কর্মসম্পাদন মিলিয়ে দেখেন এবং পার্থক্য আছে কি না তা নিরূপণ করেন।

(চ) প্রত্যাশিত ফল অর্জনের পথে বাধা অপসারণের পন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধান কর্মীদের সাথে মাঝে মাঝে সভায় বসে কর্মীর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং তাদেরকে যথাযথ পরামর্শ দেন।

পাঠ ৪.৭- এ লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন

Appraisals of managers

অনেকে ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রমের মূল্যায়নকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ''এচিলীর গোড়ালি'' (Achille's heel) বা 'দুর্বলতম দিক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যে যাই বলুক না কেনো, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপকীয় কার্যের শক্তি-সামর্থ্য এবং দুর্বলতা ও ক্রটিবিচ্যুতি জানা না থাকলে সঠিক নির্দেশনা সম্বলিত ব্যবস্থাপকীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায় দেখা দেয়। ফলে সামগ্রিক উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটে। এ জন্য ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নকে ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক। একজন ব্যবস্থাপক কীভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, সংগঠন কার্য চালান, কর্মী নিয়োগ করেন, নেতৃত্ব দেন এবং

নিয়ন্ত্রণ করেন- এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারা মানেই ব্যবস্থাপকীয় পদে সমাসীন কোনো কর্মকর্তার কার্য নৈপুণ্য বিশেষ করে ব্যবস্থাপকীয় কার্য-নৈপুণ্য, সম্পর্কে অবগত হওয়ার একমাত্র সত্যিকার পথ।

ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ

ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নের জন্য সাধ্যরণত চার ধরনের পদ্ধতি বা কৌশলসমূহ গৃহীত হয়ে থাকে:

১. সনাতনী বা চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যগত মূল্যায়ন পদ্ধতি (Traditional trait appraisal)
২. প্রতিপাদনীয় লক্ষ্যের আলোকে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন (Appraising managers against verifiable objectives)
৩. ব্যবস্থাপক হিসেবে ব্যবস্থাপকের মূল্যায়ন (Appraising managers as manager)
৪. দলগত মূল্যায়ন পদ্ধতি (A team evaluation approach)

১. সনাতনী বা চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যগত মূল্যায়ন পদ্ধতি (Traditional trait appraisal): দীর্ঘদিন ধরে এ পদ্ধতিটি প্রচলিত আছে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যের প্রকৃতির আলোকে কার্য ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত একজন ব্যক্তিকে ১০-১৫টি উত্তম বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যের সাথে কাজ করার ক্ষমতা, ন্যায়পরতা, নেতৃত্ব, বিশ্লেষণাত্মক যোগ্যতা, পরিশ্রম, বিচার-ক্ষমতা, উদ্যোগ ইত্যাদি প্রধান। এরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এ তালিকায় কাজ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন- কাজ সম্পর্কে জ্ঞান, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের যোগ্যতা, উৎপাদন ও ব্যয় সম্পর্কে জ্ঞান, পরিকল্পনানুসারে সাফল্যজনকভাবে কাজ করা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে অবগত হওয়া ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব গুণাবলির একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের পর প্রত্যেক অধীনস্থ কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণের কার্য-মানের রেটিং করা হয়। এ রেটিং-এর মধ্যে কর্মীদেরকে অত্যধিক ভালো, ভালো, মোটামুটি ভালো, অগ্রহণযোগ্য ইত্যাদি পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

২. প্রতিপাদনীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন (Appraising managers against verifiable objectives): ব্যবস্থাপকীয় কার্য ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিপাদনীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অর্থবহ এবং অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমালা কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা কর্ম নির্বাহের ভিত্তিস্বরূপ। কারণ কার্য প্রয়াসের সর্বশেষ প্রান্তবিন্দু অর্থাৎ চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যবস্থাপক বা কর্মী নৈপুণ্য ও কার্যকরভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে না। তাই পূর্ব থেকেই সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমালা নির্ধারণ করতে হয় এবং ঈপ্সিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভবিষ্যত কর্ম প্রয়াস চালানো হয়।

এ প্রক্রিয়াটিতে তিনটি পদক্ষেপ জড়িত; যথা:

(ক) ব্যাপক পর্যালোচনা (A comprehensive review)
(খ) অগ্রগতিকালীন পর্যালোচনা (Periodic review of progress)
(গ) অবিরত তদারকি (Continuous monitoring)

আসুন এ তিনটি পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেই।

(ক) ব্যাপক পর্যালোচনা (A comprehensive review): সাধারণত এক বছর সময়কালের জন্য সামগ্রিক সম্পাদনীয় কর্মকাণ্ডের একটি ব্যাপক মূল্যায়ন করতে হবে। অবশ্য অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে এরূপ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন আরও অধিকমাত্রায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে করা উচিত। প্রতিটি সময়সূচি অনুযায়ী একটি সমীক্ষা বা কেইস (case) চালানো উচিত। এছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি বৃহত্তর প্রকল্পের সমাপ্তির পর পর উক্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা দরকার। অবশ্য ব্যাপক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না। সময়-মেয়াদ মূলত কাজের প্রকৃতি, অতীতের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য পরিস্থিতিগত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

(খ) অগ্রগতি কিংবা মেয়াদভিত্তিক পর্যালোচনা (Progress or periodic review): বার্ষিক আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার সাথে সাথে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা আবশ্যক। এ ধরনের পর্যালোচনা স্বল্পমেয়াদের এবং অনেকটা আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত। কিন্তু সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ কার্যসম্পাদন করার অন্তরায়সমূহ নির্ধারণ করতে এ ধরনের পর্যালোচনা বেশ সহায়ক হয়; উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। অধিকন্তু, এ ধরনের পর্যালোচনার দ্বারা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়সমূহের পুনর্বিন্যাস সাধন ও পরিস্থিতিগত

কারণে লক্ষ্যমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন সাধন করা যায়। অনিশ্চয়তাপূর্ণ পরিবেশ মূল্যহীন বা অসংগতিসম্পন্ন লক্ষ্যকে প্রয়োজনে বাদ দেওয়া যায়।

(গ) অবিরত তদারকি (Continuous monitoring): কার্যসম্পাদন দৈনন্দিন অবিরত তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। কারণ অংশত, কোনো কাজ আদর্শ মান থেকে বিচ্যুতি হলেও পরবর্তী কালান্তিক মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করে কালক্ষেপণ করা সমীচীন নয়। তাই ত্রুটিবিচ্যুতি যাই হোক না কেনো, গোটা কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিতে হবে এবং দৈনন্দিন বিচ্যুতিসমূহ দূরীকরণের জন্য ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে যাতে ভবিষ্যতের কোনো বৃহত্তর সমস্যা এড়ানো যায়।

৩. ব্যবস্থাপক হিসেবে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন (Appraising managers as manager): বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা তাত্ত্বিকগণ ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নের এ পদ্ধতিটিকে বেশ জোরালোভাবে সুপারিশ করেছেন। কারণ ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নের উপযুক্ত ও যৌক্তিক নির্ণায়ক হলো একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে তাদেরকে গণ্য করা। এজন্য শুধু ব্যবস্থাপকীয় মৌলিক কার্য ফলাফলের নিরিখে তাদের কর্মসম্পাদনের মূল্যায়ন করা হয় না– এর সাথে ব্যবস্থাপকদের আরো বহুমাত্রিক দিকগুলো বিবেচনা করতে হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপকদের কার্য মূল্যায়ন করার জন্য তাদের কার্যাবলি পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, নেতৃত্বদান এবং নিয়ন্ত্রণ- এ পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়। অতপর প্রতিটি কার্যের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নমালা সম্বলিত একটি ‘চেকলিস্ট’ প্রণয়ন করা হয়। চেকলিস্টে প্রশ্নমালা এমনভাবে সন্নিবেশ করা হয় যাতে করে সংশিষ্ট কার্যক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় কার্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। এসব প্রশ্নের উত্তরসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের কার্য ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে চেকলিস্টে সন্নিবেশ করা হয়। অতপর প্রাপ্ত উত্তরগুলোর ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন করা হয়।

৪. দলগত মূল্যায়ন পদ্ধতি (A Team evaluation approach): সাম্প্রতিককালে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নের জন্য এ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে মূল্যায়নের মাপকাঠি হলো পরিকল্পন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠিতকরণ, সমন্বয়সাধন, কর্মী নিয়োগদান, প্রণোদিতকরণ, এবং নিয়ন্ত্রণ। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়াদি, যেমন- বিক্রয় নৈপুণ্য, কারিগরি ও প্রকৌশলিক দক্ষতা ইত্যাদিও পরিমাপক হিসেবে গণ্য হয়।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বেতন-ভাতা নির্ধারণ। পরের পাঠে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের কর্মসম্পাদন পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা করার প্রক্রিয়া কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন নামে পরিচিতি। কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের সাথে তিনটি পদক্ষেপ জড়িত: পদ সংজ্ঞায়িতকরণ, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তনের ব্যবস্থাকরণ। কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। জনপ্রিয় কতিপয় পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: গ্রাফিক রেটিং স্কেল পদ্ধতি, অলটারনেশন র‌্যাংকিং পদ্ধতি, যুগল তুলনাকরণ পদ্ধতি, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পদ্ধতি, আচরণিকভাবে সংগ্রথিত রেটিং স্কেল এবং এমবিও পদ্ধতি। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপকীয় কার্যের শক্তি-সামর্থ্য এবং দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি জানা না থাকলে সঠিক নির্দেশনা সম্বলিত ব্যবস্থাপকীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায় দেখা দেয়। ফলে সামগ্রিক উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটে। এ জন্য ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নকে ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক। ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়নের জন্য সাধ্যরণত চার ধরনের পদ্ধতি বা কৌশলসমূহ গৃহীত হয়ে থাকে: সনাতনী বা চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যগত মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রতিপাদনীয় লক্ষ্যের আলোকে ব্যবস্থাপকদের মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপক হিসেবে ব্যবস্থাপকের মূল্যায়ন এবং দলগত মূল্যায়ন পদ্ধতি।

পাঠ ৯.৬ বেতন-ভাতা নির্ধারণ
Determination of Compensation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বেতন-ভাতা কী তা বলতে পারবেন।
- বেতন-ভাতার হার নির্ধারণকালে প্রভাব বিস্তারকারী মৌলিক উপাদানগুলো কী তা বলতে পারবেন।

আনেকেই Compensation- এর বাংলা "ক্ষতিপূরণ" বলে থাকেন। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এ পদবাচ্যটির বাংলা "ক্ষতিপূরণ" না হওয়াই শ্রেয়। যেহেতু এ বিষয়টি কর্মীদের বেতন-ভাতা ও আনুতোষিক সম্পর্কিত সেহেতু অত্র গ্রন্থে Compensation- এর বাংলা "বেতন-ভাতা" ব্যবহার করা হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত কর্মী বাহিনীর নিয়োগ অপরিহার্য। কর্মীদের নিয়োগ করার পর তাদেরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রতিষ্ঠানের আরেকটি কর্তব্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকালের জন্য ধরে রাখার নিমিত্ত প্রচেষ্টা চালানোও অবশ্য কর্তব্য। কর্মীদের মনোবল বজায় রেখে তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং অনুগত, নিবেদিত কর্মী হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার কার্যকর বেতন-ভাতা ও কর্মজীবন পরিকল্পন। এ পাঠে আমরা বেতন-ভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পর পরবর্তী পাঠে কর্মী প্রশিক্ষণের ওপর আলোকপাত করব।

কর্মীদের বেতন-ভাতা
Employee compensation

কর্মীদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিশ্রমের জন্য তাদেরকে যেসব আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাকেই আমরা বেতন-ভাতা (compensation) বলে থাকি। বেতন-ভাতার দুটি উপাদান রয়েছেঃ

(ক) সরাসরি প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি, যেমন- মজুরি, বেতন, কমিশন, বোনাস ইত্যাদি এবং

(খ) পরোক্ষভাবে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি, যেমন- কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় কর্মীর জন্য বিমা, ছুটি কাটানোর জন্য ছুটি ভাতা, উৎসব-ভাতা, বাড়ি-ভাড়া, মেডিকেল-ভাতা, যাতায়াত ভাতা ইত্যাদি।

রিকি গ্রিফিন (Ricky Griffin) বেতন-ভাতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Compensation is the financial remuneration given by the organization to its employess in exchange for their work." সুতরাং বলা যায়, বেতন-ভাতা হলো কাজের বিনিময়ে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা। দক্ষ কর্মীকে আকৃষ্ট করা, তাদেরকে প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখা এবং তাদেরকে দিয়ে উঁচুমানের সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ করিয়ে নিতে হলে একটি সুষ্ঠ বেতন-ভাতা কাঠামো থাকা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানে সাম্যের ভিত্তিতে মজুরি ও বেতন কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বেতন-ভাতার জন্য নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়।

সনাতনী 'মজুরি ও বেতন প্রশাসন' (wage and salary administration) আজকাল 'বেতন-ভাতা ব্যবস্থাপনা' (compensation management) নামে পরিচিত।

বেতন-ভাতার হার নির্ধারণকালে প্রভাব বিস্তারকারী মৌলিক উপাদানসমূহ
Basic influencing factors in determining pay rates

বেতন-ভাতা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় মূলত চারটি উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোর প্রভাব নিরূপণ করা না হলে বেতন-ভাতা পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা ও ভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে। আসুন জেনে নেই এ উপাদানগুলো সম্পর্কে।

১. **আইনগত বিষয়াদি (Legal considerations):** প্রত্যেক দেশেই একাধিক আইন রয়েছে। যেগুলো বেতন-ভাতার হার বা পরিমাণ নির্ধারণের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো কোনো আইন-শ্রমিক-কর্মচারীদের নূন্যতম বেতনের হার, ওভারটাইম পারিশ্রমিকের হার এবং বিবিধ সুযোগসুবিধা বা বেনিফিটের পরিমাণ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের মধ্যে Bangladesh Labour Act 2006, Minimum Wages Act. ইত্যাদি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

২. **ইউনিয়নের প্রভাব (Union influences):** বেতন-ভাতা পরিকল্পনা কীভাবে প্রণয়ন করা হবে, পরিকল্পনায় কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, বেতন-ভাতার পরিমাণ কীভাবে অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে ইত্যাদি বিষয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালের শিল্প-সম্পর্ক অধ্যাদেশ (Industrial Relations Ordinance 1969) শ্রমিকদেরকে সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। এ অধিকারের বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন গঠন করতে পারে এবং ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষের সাথে বেতন-ভাতা নিয়ে দরকষাকষি করতে পারে।

৩. **কোম্পানির বেতন-ভাতা পলিসি (Company's compensation policy):** কোম্পানির নিজস্ব বেতন-ভাতা পলিসি বিদ্যমান থাকলে বেতন-ভাতা নির্ধারণের সময় সেটি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। কারণ এরূপ পলিসিতে বেতন-ভাতা নির্ধারণের নিয়মাবলি ও পথ-নির্দেশনা লিপিবদ্ধ থাকে।

৪. **বেতন-ভাতায় সমতা (Equity in pay):** বেতন-ভাতা নির্ধারণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বেতন-ভাতার সাথে অন্যান্য সমজাতীয় কোম্পানির বেতন-ভাতার হারের মিল থাকে। এরূপ সমতাকে বলা হয় বাহ্যিক সমতা (external equity)। এ ছাড়া কোম্পানির ভেতরেও সমজাতীয় পদের মধ্যে বেতন-ভাতার হারের মিল থাকা আবশ্যক। এরূপ সমতাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ সমতা (internal equity)।

বেতন-ভাতা নির্ধারণ কালে ব্যবস্থাপককে অবশ্যই উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখার পাশাপাশি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয়। আসুন জেনে নেই বেতন-ভাতার হার নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি।

বেতন-ভাতার হার নির্ধারণের প্রক্রিয়া

Process of establishing pay rates

বেতন-ভাতার হার নির্ধারণের সময় যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তা চিত্র ৯.২- এ দেখানো হলো।

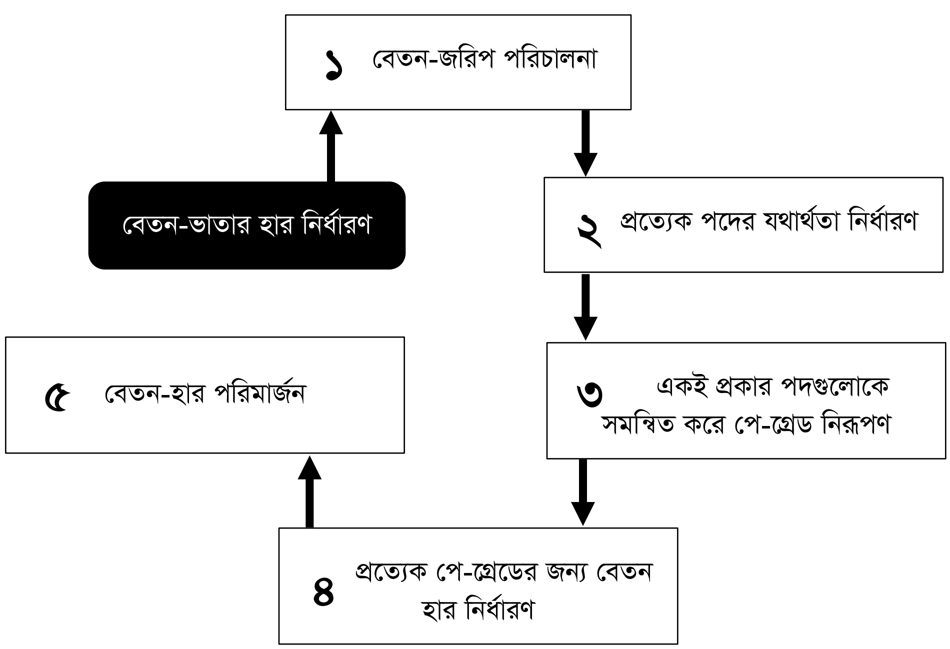

চিত্র ৯.২: বেতন-ভাতার হার নির্ধারণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ

- **বেতন-জরিপ পরিচালনা:** এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সমজাতীয় কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদের বেতন-ভাতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি আহরণ করা হয়। এসব তথ্য থেকে বেতন-ভাতা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বেতন জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে। অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্যান্য কোম্পানির কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহকরণ, পত্রিকায় প্রদত্ত চাকরির বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত তথ্য আহরণ, প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ; কনসাল্ট্যান্ট-এর মাধ্যমে জরিপ পরিচালনা ইত্যাদি।
- **প্রত্যেক পদের যথার্থতা নিরূপণ:** পদ মূল্যায়নের (job evaluation) মাধ্যমে বিভিন্ন পদের আপেক্ষিক যথার্থতা (relative worth) নিরূপণ করা হয়। একটি পদের সাথে আরেকটি পদের কার্যাবলি তুলনা করে দেখা হয়। তদনুযায়ী কোন পদ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা হয়।
- **পে-গ্রেড নিরূপণ:** পদ-মূল্যায়নের পর প্রথমে সমজাতীয় পদগুলোকে সমন্বিত করে কয়েকটি পে-গ্রেড সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানে ৭০টি বিভিন্ন পদ (job position) রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পদ আছে যেগুলোর মধ্যে দায়িত্ব বা গুরুত্বের দিক থেকে পুরোপুরি বা কাছাকাছি মিল রয়েছে। এরূপ মিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি আমরা ৭০টি পদকে ১৫টি আলাদা গ্রুপে ভাগ করি, তাহলে প্রত্যেকটি ভাগ হবে এক একটি পে-গ্রেড।
- **পে-গ্রেডের জন্য আলাদা বেতন-হার নির্ধারণ:** পে-গ্রেডের সংখ্যা নির্ধারণ করার পর প্রত্যেক পে-গ্রেডের জন্য আলাদাভাবে বেতন-ভাতার হার ঠিক করা হয়। সাধারণত মজুরি রেখা (wage curve) ব্যবহার করে গ্রেডভিত্তিক বেতন হার নির্ধারণ করা হয়।
- **বেতন হার পরিমার্জন:** এ পর্যায়ে বেতন হারে (গ্রেডভিত্তিক) কোনো অসামঞ্জস্য চোখে পড়লে তা দূর করার জন্য সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়।

বেনিফিট নির্ধারণ
Determining benefits

একটি প্রতিষ্ঠান কর্মীদেরকে যে বেতন-ভাতা দেয়, তার বাহিরে যদি কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তা বেনিফিট নামে পরিচিত। কর্মীদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এসব বেনিফিট প্রদান করা হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান মূল বেতন-ভাতার ওপর আরোপিত আয়করের (Income tax) পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে মূল বেতনের হার কম রেখে অধিক পরিমাণে বেনিফিট দিয়ে থাকে।

একটি প্রতিষ্ঠান কর্মীদেরকে বহুবিধ বেনিফিট দিতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: অসুস্থতাজনিত ছুটি-ভাতা, বছরে একবার নিজের জন্য কিংবা পরিবারের সদস্যসহ নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিন (১০ দিন/২০ দিন/৩০ দিন ইত্যাদি) অবকাশ যাপনের জন্য অবকাশ ভাতা, বিমার প্রিমিয়াম প্রদান, অক্ষমতা ভাতা (দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতা), মেডিকেল ভাতা, উৎসব ভাতা, প্রসূতিকালীন ছুটি (maternity leave), পেনশন প্ল্যান, সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতা ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

কর্মীদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিশ্রমের জন্য তাদেরকে যেসব আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাকেই আমরা বেতন-ভাতা বলে থাকি। বেতন-ভাতা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় মূলত চারটি উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোর প্রভাব নিরূপণ করা না হলে বেতন-ভাতা পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গতা ও ভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে। উপাদানগুলো হচ্ছে: আইনগত বিষয়াদি, ইউনিয়নের প্রভাব, কোম্পানির বেতন-ভাতা পলিসি এবং বেতন-ভাতায় সমতা। বেতন-ভাতা নির্ধারণ কালে ব্যবস্থাপককে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয়।

পাঠ ৯.৭ কর্মী ওরিয়েন্টশন ও প্রশিক্ষণ
Employee Orientation and Training

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পদ মূল্যায়ন কী তা বলতে পারবেন।
- পদ মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

কর্মী নির্বাচনের পরপরই ব্যবস্থাপকের কর্মী সংস্থানমূলক বা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে না। এখান থেকেই মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ বৃহত্তর পরিসরে শুরু হয়। এ পাঠে আমরা কর্মী নির্বাচনোত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব। এ তিনটি বিষয় হলো: (১) নবনির্বাচিত কর্মীদেরকে অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি, পলিসি, পরিকল্পনা ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করানো। এ পর্বটি ওরিয়েন্টশন নামে পরিচিত। অনেক প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টেশনকে 'সামাজিকীকরণ কর্মসূচি' (socialization programme) নামেও অভিহিত করে থাকে। (২) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদেরকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও দেওয়া যেতে পারে, বাইরের কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমেও দেওয়া যেতে পারে। (২) প্রশিক্ষণ ছাড়াও কর্মীদের দক্ষতা ও নিপুণতার বিকাশের জন্য অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ।

কর্মী নির্বাচনের পর পরবর্তী পদক্ষেপে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের (training and development) জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সাধারণত শ্রমিক বা অপারেটিং কর্মীদের জন্য কর্ম দক্ষতা (job skills) সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে, উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সাধারণ প্রকৃতির (general in nature) হয় এবং এসব কার্য ব্যবস্থাপকদের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশিক্ষণ পলিসির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কাজই হবে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ চাহিদা বা প্রয়োজন নির্ধারণ করা। কর্মীদের কর্ম তালিকা, কর্মী মূল্যায়ন রেকর্ড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা। নিরূপিত চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপে চাহিদা মেটানোর জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এরপর পরিকল্পনা মাফিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, অর্থাৎ নবনির্বাচিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের পর কর্মীরা প্রশিক্ষণ থেকে কতটুকু লাভবান হলো তা যাচাই করার জন্য প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে আবারও প্রশিক্ষণ চাহিদা নতুনভাবে নিরূপণ করা হয়। এভাবে প্রশিক্ষণ চক্র অব্যাহত থাকে। আসুন ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়াদিগুলো জেনে নেই।

কর্মী ওরিয়েন্টেশন
Employee orientation

নতুন কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক-নির্বাহী নিয়োগের পর তারা যাতে প্রথমে যোগদানের পর পর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারে, অন্যান্য কর্মীদের সাথে পরিচিত হতে পারে, প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি, নিয়মকানুন, সংস্কৃতি, সাংগঠনিক ব্রত ও দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে, সেজন্য ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

নবনিযুক্ত কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার প্রক্রিয়াকে ওরিয়েন্টেশন বলা হয়। এ প্রক্রিয়াকে 'প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত করানোর' প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা যায়। গ্যারি ডেসলার (Gary Dessler)-এর ভাষায়, "Employee orientation means providing new employees with basic background information

about the employer, information that they need to perform their jobs satisfactorily".[৩] ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কর্মীদের নিকট যেসব তথ্য সরবরাহ করা হয় সেগুলো হলো মূলত:

- প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগ, কোন স্থানে অবস্থিত অফিসে তাদেরকে কাজ করতে হবে;
- বিভাগীয় সহকর্মী কারা কে কোন কাজ করে;
- কারা অধস্তন ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারী;
- কী কী বিষয় তাদের আওতায় থাকবে;
- কার কাছ থেকে কীভাবে আইডেন্টিফিকেশন কার্ড (ID Card) সংগ্রহ করতে হবে;
- কাজের সময় ও ঘণ্টা কী হবে;
- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাবলি ও নিয়মকানুন;
- কর্মীসংক্রান্ত নীতিমালা;
- সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি;
- বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা;
- দৈনন্দিন কর্মের বিবরণ;
- ছুটি সংক্রান্ত নিয়মাবলি ইত্যাদি।

সঠিকভাবে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হলে নবনিযুক্ত কর্মীরা শুধু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই বিস্তারিত ধারণা পায় না, তারা বাস্তবতার স্বরূপও অনুধাবন করতে পারে। এতে চাকরিতে যোগদানের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা তিক্ত না হয়ে হৃদয়-জুড়ানো আনন্দের ঝর্ণাধারায় সিক্ত হতে পারে। নবাগতরা এ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হয়ে এগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বাড়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির (organizational culture) সাথে ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

প্রশিক্ষণ কী

What is training

প্রশিক্ষণ নতুন কিংবা পুরনো সব কর্মীকেই দেওয়া যায়। তবে নতুন কর্মীদের জন্যই প্রশিক্ষণ সর্বাধিক প্রয়োজন। কারণ তারা বিনা অভিজ্ঞাতায় বা স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রশ্ন ওঠতে পারে, প্রশিক্ষণ কী? প্রশিক্ষণ হলো নতুন বা পুরনো কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া। Gary Dessler- এর মতে প্রশিক্ষণ হলো: Training is the process of teaching new employees the basic skills they need to perform their jobs. প্রশিক্ষণ সাধারণত কর্ম-দক্ষতার (job skills) সাথে জড়িত এবং তা অপারেটিং কর্মীদের (মূলত শ্রমিক শ্রেণির ব্যক্তিদের) ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ বস্তুতপক্ষে 'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন' (management Development) নামে পরিচিত। তাই প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করার জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, একজন কর্মী তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ হলো বাস্তব শিক্ষা এবং নির্দিষ্ট কার্যসম্পর্কিত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা হয়। প্রশিক্ষণ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: প্রশিক্ষণ কর্মীদের জন্য খুবই জরুরি। প্রশিক্ষণ একদিকে যেমন নবনিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়নের সাহায্য করে, তেমনি অন্যদিকে বর্তমানে কর্মরত কর্মীদের যুগোত্তীর্ণ জ্ঞানকে আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডগলাস ম্যাকগ্রেগর প্রশিক্ষণের তিনটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, **প্রশিক্ষণ বুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে, কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে**। স্টিফেন রবিন্স গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, **প্রশিক্ষণ কর্মীদের চার প্রকার দক্ষতার (skills) মধ্যে এক বা একাধিক দক্ষতার পরিমার্জনে সহায়তা করে**। দক্ষতাগুলো হলো: মৌলিক শিক্ষার দক্ষতা,

---

[৩] Gary Dessler (2020). Human Resource Management. 16th Edition. Pearson Education.

কারিগরি দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা। আমরা সংক্ষেপে প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রকাশ করতে পারি:

প্রশিক্ষণ –

১. কর্মীদের কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি করে – দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়ায়।
২. পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির সহায়ক।
৩. নতুন উদ্ভাবিত কৌশল শেখায়, যার ফলে কর্মীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার শিক্ষা পায় এবং সহজে প্রতিযোগিদের মোকাবেলা করতে পারে।
৪. কর্মী নতুন কার্যে নিয়োজিত হলে সেটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
৫. সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কর্মীকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলে।
৬. যান্ত্রিকীকরণের (automation) যুগে কর্মীদেরকে অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ার (obsolete) হাত থেকে রক্ষা করে।
৭. অপচয় রোধে সহায়তা করে।
৮. প্রতিষ্ঠানের ব্রত, লক্ষ্য, পলিসি, কৌশল, শৃঙ্খলাবিধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বা নিয়মনীতি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মীদেরকে সচেতন করে।
৯. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিপদাপদ (health hazards) এবং নিরাপত্তা বিষয়ক নিয়মাবলি (safety rules) সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে দুর্ঘটনা হ্রাসের ভূমিকা পালন করে।
১০. প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচরীদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে কর্ম আনুগত্য ও প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য সৃষ্টি করে।

এতো গেলো প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে আমরা বোঝবো কোন কর্মীর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনা রয়েছে? ব্যবস্থাপক কি যে কেউকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাবেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজে পাওয়া যাবে যদি আমরা জানতে পারি প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে। চলুন, প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি জেনে নেই।

মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

Basic training process

একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূলত ৪টি পর্যায় থাকে (চিত্র ৯.৩ দেখুন); এগুলো হলো: (ক) প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ, (খ) প্রশিক্ষণের লক্ষ্য স্থিরকরণ, (গ) প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং (ঘ) প্রশিক্ষণের ফলাফল মূল্যায়ন।

(১) **প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ:** প্রথমেই প্রশিক্ষেণের প্রয়োজন নির্ধারণ করা অপরিহার্য। এ পর্যায়ে দেখা হয়: কোন কোন কর্মীর কী প্রকারের অদক্ষতা রয়েছে বা নতুন কৌশল প্রয়োগের কারণে কর্মীদের কী ধরনের দক্ষতাসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; কী কী বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার, অর্থাৎ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ। নতুন কর্মীদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার আলোকে ও যে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ করা হয়। আর আগে থেকে কর্মরত কর্মীদের কার্যসম্পাদন মূল্যায়নের (performance appraisal) মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বা দক্ষতার ঘাটতি নিরূপণ করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন নির্ধারণ না করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা অনেকটা গন্তব্য ঠিক না করে সাগর পাড়ি দেওয়ার মতো।

(২) **প্রশিক্ষণের লক্ষ্য স্থিরকরণ:** প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। লক্ষ্যগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য (observable) এবং পরিমাপযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রশিক্ষণ শেষে বা প্রশিক্ষণ উত্তরকালে কার্যক্ষেত্রে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের কর্মফল পরিমাপ করে প্রশিক্ষণের প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(৩) **প্রশিক্ষণের পরিচালনা:** লক্ষ্য ঠিক করার পর নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে-

- প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন;
- প্রশিক্ষণের মেথোডলজি (প্রত্যেক পদ্ধতি কীভাবে ব্যবহার করা হবে) নির্ধারণ;
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কারিকুলাম ও দৈনিন্দন সময়সূচি (schedule) তৈরি;

- প্রশিক্ষকবৃন্দের তালিকা তৈরি এবং তাদেরকে চিঠির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সময়সূচি, কারিকুলাম, পদ্ধতি ইত্যাদি জানিয়ে দেওয়া;
- প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণের সব বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া এবং বিষয়ে তাদের স্ব স্ব ঊর্ধ্বতনকে অবহিত করা যাতে প্রয়োজনীয় ছুটি পেতে অসুবিধা না হয়;
- প্রশিক্ষণ (যেমন- ওভারহেড প্রজেক্টর, টিভি-ভিসিআর, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষে প্রশিক্ষণ কার্য শুরু করা।

(৪) **প্রশিক্ষণের ফলাফল মূল্যায়ন:** প্রকৃতপক্ষে এ পর্যায়ের কাজ আংশিকভাবে প্রশিক্ষণের দিন প্রথম পর্বেই শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শুরুর আগ মুহূর্তে কর্মীদের একটি প্রাক পরীক্ষা (pretest) নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো তারা প্রশিক্ষণভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান রাখে তৎসম্পর্কিত একটি রেকর্ড রাখা। এ রেকর্ডের সাথে পরে প্রশিক্ষণ শেষে যে পরীক্ষাটি (posttest) হবে (একই প্রশ্নের ভিত্তিতে) তার রেকর্ড মিলিয়ে দেখা হয়। এ থেকে বোঝা যাবে, একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ থেকে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। এভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়।

চিত্র ৯.৩: প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

Training methods

বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। যদিও বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলো অতিমাত্রায় ডিজিটাল ও অনলাইন প্রশিক্ষণের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে, তথাপি অনেক প্রতিষ্ঠান এখনো চিরাচরিত ও সমকালীন প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করছে। এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পাঁচ ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়:

(১) কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (On-the job training): কর্মকালীন প্রশিক্ষণ বলতে এমন ধরনের প্রশিক্ষণকে বোঝায় যেখানে প্রশিক্ষণার্থী কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। নিয়োগ প্রাপ্তির পর কাজে যোগদান করেই নবনিযুক্ত কর্মী বাস্তব পরিবেশে তার বিভাগের মধ্যেই হাতেকলমে কাজ শেখে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শ্রমিক আইসক্রিম কারখানায় যোগদানের পর আইসক্রিম বানানো মেশিনে কাজ শুরু করে দেয়। একজন পুরাতন দক্ষ কর্মী তার সাথে থাকে, সেই দক্ষ সহকর্মী নতুন কর্মীকে মেশিন চালানোর সব বিষয় বোঝিয়ে দেয়, দেখিয়ে দেয় হাতেকলমে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এরূপ প্রশিক্ষণকেই বলা হয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ। কাজে কর্মরত থাকা অবস্থায় কাজ করতে করতেই কাজ শিখে বলে এ প্রক্রিয়া কর্মকালীন প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত। এরূপ প্রশিক্ষণের সময় নতুন কর্মীর সাথে একজন অভিজ্ঞ কর্মী বা সুপারভাইজার থাকে।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ বহু প্রকারের হতে পারে। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো: (ক) পদ পরিবর্তন এবং (খ) কোচিং বা শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ।

(ক) পদ পরিবর্তন (Job rotation): এ পদ্ধতিতে একজন কর্মী পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট সময় পর পর বিভিন্ন পদে কাজ করে। ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণে এ পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন পদে বিভিন্ন সময়ে কাজ করার ফলে ব্যবস্থাপকেরা বিভিন্ন পদের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো ভালোভাবে বোঝে নিতে পারেন। এতে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তাদের সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়।

(খ) কোচিং বা শিক্ষানবিশি (Coaching of apprenticeship method): এ পদ্ধতি Understudy Assignment নামেও পরিচিত। এ পদ্ধতিতে কর্মীদেরকে একজন অভিজ্ঞ দক্ষ কর্মী বা তাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্মরত অবস্থায় সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য। প্রশিক্ষণার্থী তার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিজ্ঞ সহকর্মীর কাজ দেখে দেখে নিজকে দক্ষ করে তোলে। বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তারা সমস্যা সমাধানে দক্ষ হয়ে ওঠে। এ পদ্ধতির সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রশিক্ষকের, জ্ঞান, দক্ষতা ও তা বিলিয়ে দেওয়ার নৈপুণ্যের ওপর।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণের কতিপয় সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, এটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়সাধ্য। উৎপাদনে বা কর্মে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ পাওয়ার কারণ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে না এবং ক্লাসরুমের প্রশিক্ষণের মতো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন না হওয়ায় খরচ বাড়ে না। দ্বিতীয়, এরূপ প্রশিক্ষণ শিক্ষার সহায়ক। কারণ প্রশিক্ষনার্থী বাস্তবে কাজ করার সময়েই বিভিন্ন বিষয় শিখে থাকে। তৃতীয়, তার কাজে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী সাথে সাথে সহকর্মী বা তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে জেনে নিতে পারে।

(২) বক্তৃতা (Lecture): বক্তৃতার মাধ্যমেও কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। শ্রেণিকক্ষে কর্মীদেরকে বসিয়ে প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষণার্থীরা বক্তৃতা শোনার পর বা শোনার সময়েই যেসব বিষয় বোঝেনি সে সম্পর্কে প্রশিক্ষককে প্রশ্ন করে সাথে সাথে জবাব নিয়ে নিতে পারে। বক্তৃতা পদ্ধতি শ্রমিক-কর্মচারী কিংবা ব্যবস্থাপক সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এ পদ্ধতিরে সফলতা বক্তার বিচক্ষণতা ও প্রশিক্ষণার্থীদের শোনার আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। বক্তৃতার সময় মাঝে মাঝে ওভারহেড বা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা হলে, ভিডিও ক্যাসেট প্লে করে দেখালে কিংবা মাঝেমধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে টুকটাক প্রশ্ন করা হলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে অনবরত কথা শোনার একঘেঁয়েমি সৃষ্টি হয় না।

(৩) অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতি (Audo-visual techniques): শ্রমিক-কর্মচারী এবং ব্যবস্থাকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার শ্রবণ-দর্শনযোগ্য বা অডিও-ভিজুয়্যাল কৌশল অবলম্বন করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে কারখানার কাজের প্রবাহ, মেশিন চালানোর কলাকৌশল, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ, গ্রাহকদের সাথে বিক্রয়কর্মীর আচরণ, কার্যকরভাবে টেলিফোনের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় ভিডিও টেপের মাধ্যমে ধারণ করে ভিসিআর- এ দেখানো হলে প্রশিক্ষণার্থীরা ভালোভাবে বিষয়গুলো হৃদয়ংগম করতে পারে। উল্লেখযোগ্য অডিও-ভিজুয়্যাল পদ্ধতি হলো চলচ্চিত্র, অডিও টেপ, ভিডিও টেপ, ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন, ওভারহেড প্রজেক্টর, স্লাইড ইত্যাদি। আজকাল উৎপাদন প্রক্রিয়া, মেশিন চালানো, শ্রমিকসংঘের সাথে দরকষাকষি, ব্যবস্থাপকীয় যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির ওপর রেডিমেড ভিডিও পাওয়া যায় (উৎসাহী ব্যক্তিরা ব্রিটিশ কাউন্সিল ও USIS- এ যোগাযোগ করতে পারেন)।

(৪) টেলিট্রেনিং (Teletraining): ইদানিংকালে উন্নত দেশগুলোতে টেলিট্রেনিং-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে থেকে প্রশিক্ষক অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। টেলিভিশন হুক-আপ (hookup) ও ইলেক্ট্রোনিক কানেকশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। বক্তা এবং শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিকমিউনিকেশন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ভিডিও কনফারেন্সিং এবং টেলিকনফারেন্সিং টেলিট্রেনিং বিশেষ। বস্তুত পক্ষে এগুলোর মাধ্যমে ভিডিও পর্দায় বক্তা ও প্রশিক্ষণার্থীরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পায় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য প্রয়োজন বিশেষভাবে তৈরি ভিডিও কনফারেন্স রুম, ভিডিও ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, টেলিভিশন মনিটর এবং একটি

কম্পিউটার। কম্পিউটার codec device নামে বিশেষ ধরনের কৌশল স্থাপন করা থাকে যা ভিডিও ইমেজ ও এনালগ শব্দমালার তরঙ্গ প্রবাহকে ডিজিটাল সিলনালে রূপান্তরিত করে এবং যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যেমে অন্যত্র স্থানান্তর করে।

(৫) কর্ম-বহির্ভূত প্রশিক্ষণ (Off-the job trainign): কর্মীদেরকে যখন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা বাইরে কর্মরত অবস্থায় না রেখে অর্থাৎ কর্ম পরিবেশের বাইরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তখন সে প্রশিক্ষণ কর্ম-বহির্ভূত প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত। জনপ্রিয় কর্ম-বহির্ভূত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো হলোঃ ভেস্টিবিউল প্রশিক্ষণ, সাইমুলেটেড প্রশিক্ষণ, ব্রেইনস্টর্মিং, সংবেদনশিলতা প্রশিক্ষণ, ফ্লাইং স্কোয়াড্রন পদ্ধতি, অভিনয়মূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। আসুন এ পদ্ধতিগুলো সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই।

(ক) ভেস্টিবিউল প্রশিক্ষণ (Vestibule training): এটি এমন এক ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে একজন শ্রমিক তার আসল কাজে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কিন্তু সে উৎপাদন কার্যে জড়িত থাকে না। অর্থাৎ একই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও সে সরাসরি উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে না, কর্মের বাইরে থেকেই মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে মেশিন চালানোর শিক্ষা গ্রহণ করে। এরূপ পদ্ধতির সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো, শ্রমিককে সরাসরি উৎপাদনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে সে অনভিজ্ঞতার কারণে মেশিন নষ্ট করে ফেলতে পারে কিংবা নিজেই দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। জুটমিল, টেক্সটাইল মিল, গাড়ির কারখানা, পাইলট ট্রেনিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভেস্টিবিউল ট্রেনিং বহুলভাবে প্রচলিত।

(খ) সিমুলেটেড প্রশিক্ষণ (Simulated training): এ প্রশিক্ষণ ভেস্টিবিউল প্রশিক্ষণেরই মতো। শুধু পার্থক্য হলো, এ ক্ষেত্রে আসল যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে হুবহু একই রকমের ডামি (dummy) যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মেশিনটি আসল নয়, বিকল্প- শুধু প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আসল উৎপাদন কার্যে এরূপ মেশিন ব্যবহার করা হয় না।

(গ) ব্রেইনস্টর্মিং (Brainstorming): এরূপ প্রশিক্ষণে কয়েকজন কর্মীর একটি দল (সাধারণত ৭-৮ জন) একত্রে বসে কোনো সমস্যার সমাধান বের করার প্রয়াস পায়। আলেক্সান্ডার অসবোর্ন (Alexandar Osborne) এ পদ্ধতির উদ্ভাবক। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মূলনীতি হলো, কেউ দলভুক্ত অন্য কোনো সদস্যের দেওয়া ধারণা বা আইডিয়ার সমালোচানা করতে পারবে না। সবাই সভায় বসে নিজ নিজ ধারণা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবে, যাতে নতুন নতুন সৃজনশীল ধারণার একটি ভান্ডার সৃষ্টি করা যায়। ব্যতিক্রমধর্মী ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়। ফলে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সনাতনী পন্থা পরিহার করে নিত্য নতুন কলাকৌশল প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(ঘ) সংবেদনশিলতা প্রশিক্ষণ (Sensitivity training): দলগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীদের বিশেষ করে ব্যবস্থাপকদের, আচরণ পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সংবেদনশিলতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকজন কর্মীকে একটি খোলামেলা, মুক্ত পরিবেশে জড়ো করা হয় এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। একজন আচরণ-বিশারদ (behavioral expert) আলোচনায় সহায়তা করেন। তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদেরকে খোলামেলা মন নিয়ে তাদের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস ও মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। এরূপ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজের আচরণের স্বরূপ যেমন বোঝতে পারেন, তেমনি অন্যের আচরণের প্রতি সংবেদশীল হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।

(ঙ) ফ্লাইং স্কোয়াড্রন পদ্ধতি (Flying squadron method): এ পদ্ধতি অনুসারে কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে (শ্রমিক বা ব্যবস্থাপক) একটি স্কোয়াড্রন (দল) হিসেবে সংগঠিত করা হয় এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বিভিন্ন কার্যে (jobs) সার্বিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত আরও বাড়তি তথ্য প্রদান করা হয়। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। পরবর্তীতে প্রয়োজন মতো তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োজিত করা সহজতর হয়।

বর্তমানে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের মধ্যে সিডি, ডিভিডি, ভিডিওটেপ পদ্ধতি জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী উক্ত মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে নির্দিষ্ট টেকনিক বা তথ্য সম্পর্কে নিজেকে প্রশিক্ষিত

করে। এছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিং, টেলিকনফারেন্সিং ও স্যাটেলাইট টিভি ব্যবহারেরও প্রচলন রয়েছে। বর্তমান সময়ে অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণে ই-লার্নিং পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সারসংক্ষেপ

নবনিযুক্ত কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার প্রক্রিয়াকে ওরিয়েন্টেশন বলা হয়। এ প্রক্রিয়াকে 'প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত করানোর' প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা যায়। সঠিকভাবে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হলে নবনিযুক্ত কর্মীরা শুধু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই বিস্তারিত ধারণা পায় না, তারা বাস্তবতার স্বরূপও অনুধাবন করতে পারে। প্রশিক্ষণ নতুন কিংবা পুরনো সব কর্মীকেই দেওয়া যায়। প্রশিক্ষণ হলো নতুন বা পুরনো কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ একদিকে যেমন নবনিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়নের সাহায্য করে, তেমনি অন্যদিকে বর্তমানে কর্মরত কর্মীদের যুগোত্তীর্ণ জ্ঞানকে আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূলত ৪টি পর্যায় থাকে; এগুলো হলো: (ক) প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ, (খ) প্রশিক্ষণের লক্ষ্য স্থিরকরণ, (গ) প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং (ঘ) প্রশিক্ষণের ফলাফল মূল্যায়ন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। তবে পাঁচ ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়: কর্মকালীন প্রশিক্ষণ, বক্তৃতা, অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতি, টেলিট্রেনিং এবং কর্ম-বহির্ভূত প্রশিক্ষণ।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? একটি প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. মানব সম্পদ পরিকল্পন বলতে কী বোঝায়? মানব সম্পদ পরিকল্পনের পদক্ষেগুলো আলোচনা করুন।
৪. মানব সম্পদ পরিকল্পনের সাথে জড়িত কার্যাবলি আলোচনা করুন।
৫. কর্মী বাছাইকরণ বা রিক্রুটমেন্ট বলতে কী বোঝেন? কর্মী বাছাইকরণের বিভিন্ন উৎসগুলো কী কী?
৬. পদোন্নতি কী? পদোন্নতির ভিত্তি কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা দিন।
৭. নিম্নোক্ত পদবাচ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন:
ক) পদাবনতি খ) পদচ্যুতি গ) পদত্যাগ ঘ) ছাঁটাই ঙ) অবসর গ্রহণ।
৮. আপনি কীভাবে একজন কর্মীর কর্ম বিবরণী তৈরি করবেন? কর্ম বিবরণীতে সাধারণত কী কী বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে? একটি কর্ম বিবরণীর উদাহরণ দিন।
৯. পদ মূল্যায়ন কী? এর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মাতমত দিন।
১০. পদ মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দিন।
১১. কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন কী? কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন কেন প্রয়োজন? কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করুন।
১২. কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের সংজ্ঞায় সাক্তকরণ, পরিমাপ ও ব্যবস্থানা- এ তিনটি পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা দিন।
১৩. কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের জন্য কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১৪. কর্মী ওরিয়েন্টেশন বলতে কী বোঝেন? ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে কর্মীদের নিকট কী কী তথ্য সরবরাহ করা হয়?
১৫. প্রশিক্ষণ কী? প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মধ্যে কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে? কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন প্রয়োজন?
১৬. মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
১৭. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি কী কী? বিভিন্ন প্রকার কর্মকালীন ও কর্ম-বহির্ভূত প্রশিক্ষণের বিবরণ দিন।